ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™ SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ২ সংখ্যা ।। ৭ ভাদ্র, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ২৪ আগস্ট, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

ভারতকে দাবিয়ে রাখতে জঙ্গিদের মদত দিচ্ছে চীন

গূঢ়পুরুষ ।। ভারতে ইসলামের নামে নির্বিচারে নরহত্যা চালায় যে সব জেহাদি জঙ্গি সংগঠন তাদের অন্যতম জইস-ই-মহম্মদ। এই জঙ্গিদের প্রধান মৌলানা মাসুদ আজহারকে নিষিদ্ধ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত করার প্রস্তাবে লাল চীনের আপত্তি আছে। চীনের বিরোধিতার জন্যই প্রতিনিধি এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন এই প্রস্তাবে চীনা প্রতিনিধি দাই বিঙ্গু-র সমর্থন চেয়েছিলেন। কিন্তু চীনা প্রতিনিধির সাফ কথা, ভারত অরুণাচলের উপর চীনের দাবী মেনে নিলে নিরাপত্তা পরিষদে জইসের বিরুদ্ধে আনা ভারতের প্রস্তাব চীন বিবেচনা করবে। তার আগে নয়।

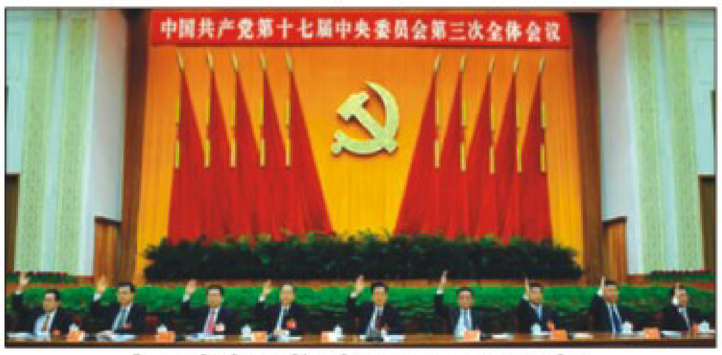

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো সদস্যবৃন্দ। (ফাইলচিত্র)

ইউনাইটেড নেশনসের নিরাপত্তা পরিষদে জইসের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ভারতীয় প্রস্তাব তোলা যাচ্ছে না। লাল চীনের কম্যুনিস্ট শাসকদের মদত ও প্রশ্রয়ে মাসুদ ও তার সংগঠন ভারতে হিংসা ছড়িয়ে চলেছে। জানা গেছে যে, জইস জঙ্গিদের হাতিয়ার করে চীনা শাসকদল ভারতের অরুণাচলে জমি দখল করতে চাইছে। ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য সাম্প্রতিক বৈঠকে জইসকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার বিষয়টি উঠেছিল। বৈঠকে ভারতীয় নিরাপত্তা পরিষদে চীন বাদে বাকি সব সদস্য দেশের প্রতিনিধিরাই জইস-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার প্রস্তাবে সহমত। কিন্তু চীন "ভেটো" প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে ভারতের প্রস্তাবটি তুলতে দিচ্ছে না।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে নেপালের কাঠমাণ্ডু থেকে দিল্লী যাওয়ার পথে এয়ার ইন্ডিয়ার আই সি-৮১৪ নম্বর উড়ানের বিমানটিকে যাত্রীসহ ছিনতাই করে তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের কান্দাহারে নিয়ে যায় জইসের

(এরপর ৪ পাতায়)

আল-জাজিরা-র সমীক্ষা

৫৯ শতাংশ পাকিস্তানী আমেরিকার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কাতারের টি ভি চ্যানেল আল জাজিরা-র সাম্প্রতিক এক জনমত সমীক্ষায় উঠে এসেছে পাকিস্তানীদের শতকরা ৫৯ জন

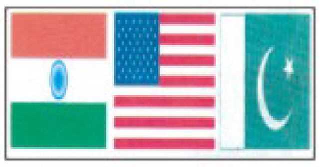

আমেরিকাকেই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক বলে মনে করে। মাত্র ১৮ শতাংশ পাকিস্তানী ভারতকে পাকিস্তানের পক্ষে বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করেছে। সম্প্রতি কাতারের জনপ্রিয় বৈদ্যুতিন সংবাদ চ্যানেল 'আল জাজিরা' গত ২৬-২৭ জুলাই-এ পাকিস্তানের প্রধান চারটি প্রদেশ — পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-এর ২৬৬২ জন নাগরিককে মিলিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে জনমত সমীক্ষা করে। এইসব নাগরিকরা ওই চার প্রদেশের শহর ও গ্রাম দুই অঞ্চলেই বসবাস করে। সেই সমীক্ষায় পাকিস্তানীরা পাকিস্তানের সর্বাধিক মদতদাতা আমেরিকাকেই বেশী ভয়াবহ বিপদ বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। এছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে পাক নাগরিকদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জরদারির নেতৃত্বকে মাত্র দশভাগ পাকিস্তানবাসী সমর্থন জানিয়েছে।

(এরপর ৪ পাতায়)

লালগড়ে নৈরাজ্য

দিনে যৌথবাহিনী, রাতে মাওবাদী

লালগড়ে মাওবাদী নেতা বিকাশ সাংবাদিকদের মুখোমুখি। (ফাইলচিত্র)

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। যৌথ বাহিনীর লালগড় অভিযান অনেক ঢাকঢোল বাজিয়ে শুরু হলেও বাস্তবে কাজের কাজ যে কিছুই হয়নি তা স্বীকার করে নিলেন খোদ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব অর্ধেন্দু শেখর সেন। অবস্থা এমনই যে লালগড় ও সন্নিহিত এলাকার প্রায় বারোটি স্কুলে যৌথবাহিনী ঘাঁটি গেড়ে বসায়, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া লাটে উঠেছে। এমনকী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পড়াশোনার অধিকার দাবী করলে তাদের কপালে জুটেছে লাঠির বাড়ি। ফল হয়েছে উল্টো। জনসমর্থন ও সহানুভূতি আদায় করে নিয়েছে জনগণের কমিটি এবং মাওবাদীরা। ফলে জঙ্গলমহলে দিনের বেলায় যৌথবাহিনীর অত্যাচার, আর রাতে চলছে মাওবাদী গেরিলাদের শাসন। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন এখন কৌশল বদলের নামে নিজেদের গা বাঁচাতে চাইছে। যদিও রাজ্যের পুলিশ দপ্তরের দেখভাল খোদ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যই করে থাকেন।

জনগণের কমিটির নেতা লালগড়ের আমলিয়া গ্রামের ছত্রধর মাহাতো আর মাওবাদীদের প্রথম সারির নেতা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষানজী এবং বিকাশ লালগড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার, জনসভায় ভাষণ, মোবাইলে এস এম এস, ফোনে '২৪ ঘন্টা চ্যানেল'কে ইন্টারভিউ দিচ্ছে। তবুও রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের যৌথবাহিনী এবং প্রশিক্ষিত কোবরারা তাদের টিকিটিও ছুঁতে পারেনি। অথচ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে

(এরপর ৪ পাতায়)

এল টি টি ই-র ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে মাওবাদীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে 'মাওবাদীদের সর্বাপেক্ষা কঠিন বিপদ বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তাবাহিনীর কর্মীদের

প্রভাকরণ

বেকায়দায় ফেলে মেরে ফেলে মাওবাদীরা। এই ঘটনা তো বটেই, সেইসঙ্গে মাওবাদীদের সাম্প্রতিক একটি নথি প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগের যথার্থতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ওই নথিতে বলা হয়েছে — সি পি আই (মাওইস্ট) দলের গেরিলাদের শ্রীলঙ্কার এল টি টি ই-র ধ্বংস হওয়ার ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। নিজেদের বিষয়ে অতিরিক্ত উচ্চ ধারণার ফলেই তামিল টাইগাররা নিশ্চিহ্ন হয়েছে বলে গেরিলাদের সতর্ক করা হয়েছে। নতুন নির্দেশিকা হিসেবে কুড়ি পাতার বিশেষ নীতি সংক্রান্ত নথি গত জুন মাসে গভীর জঙ্গলে এক গোপন ঘাঁটিতে মাওবাদী নেতারা তৈরী করে তা

মাওবাদী নেতা কিষানজী

দলের গেরিলাদের জানিয়েছেন। ওই নথিতে বলা হয়েছে, ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের নবতম সংগ্রাম বৃটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম অপেক্ষা অনেক ব্যাপক এবং ভয়াবহ হবে। ইংরেজীতে তৈরি ওই নথির শিরোনাম হল — 'Post Election Situation, Our Tasks'। ফুটনোটে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গৃহীত পরিকল্পনার

(এরপর ৪ পাতায়)

আনকোরা পরিবহন মন্ত্রী নিজের এলাকাতেই ব্রাত্য

অনুপ নাথ, উত্তর ২৪ পরগণা ।। পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পর থেকেই ওই মন্ত্রী পদের দাবিদার নিয়ে তীব্র মতবিরোধ দেখা গিয়েছিল সিপিএমের অন্দরমহলে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চেয়েছিলেন পরিবহন দফতর নিজের হাতেই রাখতে। কিন্তু উত্তর ২৪ পরগণা জেলা নেতৃত্বের চাপে পড়ে অবশেষে আনকোরা অযোগ্য নৈহাটির বিধায়ক রঞ্জিত কুণ্ডুকে মন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত নেন আলিমুদ্দিন নেতৃত্ব, এমনকী মানস মুখার্জি ও রবীন মণ্ডলের নামও ঘোরাফেরা করছিল। সিপিএমের নেতাদের একাংশের ধারণা, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বুদ্ধ-সুভাষ লবির মধ্যে সমতা রাখতে এ এক নয়া পদক্ষেপ বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর। যতই গোষ্ঠীকোন্দল ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করুক উচ্চ নেতৃত্ব; কিন্তু পরিস্থিতি যে ক্রমশ জটিল আকার নিচ্ছে তাও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন আলিমুদ্দিনের নেতারা। ইতিমধ্যেই জেলার রঞ্জিতবাবুর বিরোধী শিবিরের নেতারা ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেছেন। তবে আজকের বিষয়, রঞ্জিতবাবুর পরিবহন মন্ত্রী হওয়ার খবরে বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বসিত নন নৈহাটি অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন সিটুর জেলা কমিটির সম্পাদক হলেও ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের হাল একটুকুও বদলাতে পারেননি। উল্টে নৈহাটি শিল্পাঞ্চলকে শ্মশানে পরিণত করার নায়ক

রঞ্জিত কুণ্ডু

বর্তমান পরিবহন মন্ত্রীই। গৌরীপুর জুটশিল্পে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ হারায়, রাজ্য সরকারের আই পি পি কাগজ কল বন্ধ হবার পরও, বিকল্প কোনও কারখানা গড়ে ওঠেনি। জনসন্ এন্ড নিকেলসনের মতো নামী রং কারখানা আজও খোলেনি। নৈহাটি জুটমিল ও নদীয়া জুটমিল ধুঁকছে। এমনকী রাজেন্দ্রপুরের মৎস্য প্রকল্পের জমিতে জিন্দালদের কারখানা তৈরীতে সবচেয়ে বেশী উদ্যোগী হয়েছিলেন ওই সিটু নেতা। যিনি নিজের বিধানসভা অঞ্চলের হাল ফেরাতে পারেন না, তিনি রাজ্যের কি হাল ফেরাবেন? এমনই প্রশ্ন নৈহাটির শ্রমজীবী মানুষের, নৈহাটি বিধানসভা এলাকার গৌরীপুর ও হাজিনগর অঞ্চলের মানুষ পরিবহন মন্ত্রীর নাম শুনলেই 'তেলে বেগুনে' জ্বলে ওঠেন। কর্মহারা শ্রমজীবী মানুষদের অভিযোগ, মিল মালিকদের

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন —
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

চীন ভারতকে টুকরো করার ছক কষছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। চীন ভারতকে কুড়ি থেকে তিরিশটি স্বাধীন রাষ্ট্রে ভেঙে ফেলার কূট-পরিকল্পনা করছে। এবং এজন্য চীনকে সাহায্য করবে চীনের বন্ধুরাষ্ট্র — পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভূটান ও নেপাল। এরমই একটি সংবাদ সম্প্রতি বিভিন্ন পত্রিকায় বের হয়েছে। চীনের একটি গবেষণা সংস্থা চায়না ইন্টারন্যাশান্যাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (সি আই আই এস এস) যার ওদেশে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে — তারাই বেজিং কর্তৃপক্ষকে এরকম পরামর্শ দিয়েছে। চীনা ভাষায় ওই সংস্থার ওয়েবসাইটে পুরো বিষয়টা লেখা হয়েছে। এই ভারতকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার এই খবর যখন বাজারে এসেছে তখন ভারত-চীন সীমান্ত আলোচনার ত্রয়োদশতম গোল-টেবিল বৈঠক নয়াদিল্লীতে (৯ আগস্ট) সবেমাত্র শেষ হয়েছে। বৈঠকে ভারত ও চীন পরস্পর কৌশলগত বিশ্বাস এবং সহযোগিতার উপযোগিতা বিষয়ে বর্তমান বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে একমত হয়েছে। সি আই আই এস এস-এর থিঙ্কট্যাঙ্ক হিসেবে চীনে পরিচিতি আছে। তাই তাদের পরামর্শ যে চীনের সাম্রাজ্যবাদী, বিস্তারবাদী তথা সাম্যবাদী সরকারের পছন্দ হবে তা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়।

চেন্নাই-এর সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ এর ডিরেক্টর ডি এস রাজনের মতে ওই প্রবন্ধের লেখক ঝান লিউ-এর যুক্তি হল তথাকথিত বিশাল ভারতরাষ্ট্র হল ইতিহাসের পাতায়, যার ঐক্যের মেটালিক ভিত্তি হিন্দুধর্ম। প্রবন্ধে আরও রয়েছে, ভারত একেবারেই হিন্দু ধার্মিক রাষ্ট্র। তার আরও ভিত্তি হল জাত-পাত শোষণ। অবশ্য ভারত এখন ক্রমশ আধুনিক হচ্ছে। ঝাল-লিউ-র আরও অভিমত হল, এশিয়াতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়তা বা জাতীয়তা রয়েছে। তার মধ্যে অসমীয়া, তামিল, কাশ্মীরীরা নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষপাতী।

ওই ওয়েবসাইটে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী সংস্থা ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম-কে সবরকম সাহায্য করতে চীন সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনে ভারতকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতেও বাংলাদেশকে সর্বতো সহায়তা করার কথা বলা হয়েছে। রাজন-এর কথায় চীনের সরকারি সম্মতি ব্যাতিরেকে লেখকের পক্ষে ওই ভারত বিরোধী প্রবন্ধ প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।

উত্তরবঙ্গে কমিউনিস্টরা ভাঙছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের কমিউনিস্ট সংগঠন নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হতে চলেছে। অর্থাৎ আরও একবার ভাঙছে। তারা নতুন রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংবাদ মাধ্যমের সহযোগিতা প্রার্থনা করে সম্প্রতি একটি বার্তা পাঠিয়েছে। ওই বার্তায় বলা হয়েছে —

"দীর্ঘ পাঁচ দশক থেকে উত্তর-বঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশে কমিউনিস্ট নামধারী পার্টিগুলি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টির যা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তা করছে না। যে কারণে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কমিউনিস্ট অর্গানাইজেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরকম পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমরা উত্তরবঙ্গের কমিউনিস্ট সংগঠন গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।"

এই সময়

প্রতিভা বিকাশ

শুধু বড় হলেই নয়, মাতৃগর্ভে থাকাকালীনই বাচ্চাদের প্রতিভার বিকাশ হয়। সদ্য স্কুলে পা রাখা পড়ুয়াদের মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে এমনই জানা গেছে। গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের বাড়বাড়ন্ত সুস্থ স্বাভাবিক হলে, প্রতিভারও বিকাশ ঘটে। সেই সঙ্গে মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করে বাচ্ছার স্বাস্থ্যও। 'পার্থস' টেলিথন ইনস্টিটিউট ফর চাইল্ড হেলথ রিসার্চ' সম্প্রতি এক সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্য জানতে পারে।

প্রলোভন

প্রলোভনের শিকার হচ্ছে হিন্দু যুবতীরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে প্রলোভনের বসেই মুসলিম যুবককে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে তারা। কেরলের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা সর্বাধিক। এক পঞ্চ ায়েতের হিসাব অনুযায়ী গত ছ'মাসে কেরলে ৪ হাজারেরও অধিক বিয়ের ক্ষেত্রে এমনটা দেখে গেছে। কেরলের মুসলিম অধ্যুষিত মল্লপুরম, কোজিকোড় ও কাসরকৌড়ের মতো জেলাগুলিতে এই ঘটনা বেশি ঘটেছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বিয়ের জন্য হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তরকরণের পিছনে মুসলিম সংগঠনগুলিরও পরোক্ষ মদত রয়েছে।

মদতে পাক

ভারতে জাল নোট ছড়াতে উঠে পড়ে লেগেছে পাকিস্তান। ভারতকে দুর্বল করতে, পুরনো হাতিয়ারকেই কাজে লাগাচ্ছে তারা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া নোটের ৪০ শতাংশ পাকিস্তানে তৈরি বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে করাচি, কোয়েটা, পেশোয়ার-এর মতো বেশ কয়েকটি শহরে আই এস আই-এর মদতে এই কাজ চলছে। কেন্দ্র সরকারও দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া নোটের পিছনে পাকিস্তানের যোগসাজস খুঁজে পেয়েছে।

ভারতীয় সিনেমা

বছর বছর বাড়ছে ভারতীয় সিনেমার সংখ্যা। সেই সঙ্গে দর্শকও। অত্যাধুনিক যুগে টিকিটও কম বিক্রি হয় না এদেশে। বিশ্বের প্রধান তিনটি সিনেমা নির্মাণকারী দেশের মধ্যে ভারত শীর্ষে। ভারতের স্থান যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও চীনের থেকেও সবার আগে। দর্শকের সংখ্যাও ভারতে অনেক। ২০০৭ সালে ভারতের তিন প্রধান চলচ্চিত্র নির্মাণকারী শহর মুম্বাই, চেন্নাই ও হায়দরাবাদে ১,১৩২টি চলচ্চিত্র নিমার্ণ হয়। ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৫২০টি, জাপানে ৪১৮, চীনে ৪০০টি সিনেমা হয়। ৯টি সর্বোচ্চ সংখ্যক চলচ্চিত্র নির্মাণকারী দেশের মধ্যে ভারতের টিকিটের দামও কম।

নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ

সোয়াইন ফ্লু নিয়ন্ত্রণেও ব্যর্থ রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সোয়াইন ফ্লু-র মোকাবিলার কথা বলা হলেও, এরাজ্যের পরিকাঠামো অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় সব দিক থেকেই অনুন্নত। এখনও পর্যন্ত সরকার কোনও বেসরকারি হাসপাতালে ফ্লু-র চিকিৎসার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। শুধু তাই নয়, চেন্নাই, দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর, পুনের মতো মেডিকেল টিমও এতটা সক্রিয় নয় রাজ্যে। ফ্লু-র নিয়ন্ত্রণে সর্বত্র মাস্কও পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও কোথাও পাওয়া গেলেও, তা চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে এতসবের পরেও, স্বাস্থ্যভবনের জনস্বাস্থ্য বিভাগ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

রোগ প্রতিরোধ

রোগ প্রতিরোধে শুধু অ্যালোপ্যাথি আর একমাত্র ভরসা নয়, বিকল্প খোঁজা হচ্ছে অ্যালোপ্যাথিরও। দেশের সব রাজ্যের সব জেলাতেই এই ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা গেছে। খোদ কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে অ্যালোপ্যাথির পরিবর্তে আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, যোগ, ইওনানি, সিদ্ধ প্রভৃতি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিকল্প হিসাবে ভাবা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৬০০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ও সনাতন চিকিৎসা ব্যবস্থাকেই জনপ্রিয় করে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

কৃষ্ণের জন্য

হাসপাতাল নাকি বিধানসভার লাইন — বোঝার উপায় ছিল না জন্মাষ্টমীর দিন। ১৩ আগস্ট কলকাতার বেশিরভাগ হাসপাতালেই ছিল প্রসূতিদের দীর্ঘ লাইন। কারণ জন্মাষ্টমী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনেই নিজের সন্তানকে জন্ম দিতে চেয়েছিলেন বেশিরভাগ প্রসূতি। যাতে বড় হয়ে কৃষ্ণের মতোই পরাক্রমী, পবিত্র হয়ে ওঠে। সেই মতো ডাক্তারকে অনুরোধ, অপারেশন থিয়েটার বুকিং সব কিছুই সেরে ফেলেছিল পরিবারের লোকেরা। প্রায় ১০০ জনের কাছাকাছি প্রসূতি জন্মাষ্টমীর দিনে সন্তান প্রসব করতে পেরে খুশী হয়েছেন। হাসপাতালগুলির হিসাবে দেখা যাচ্ছে, এদিন ৫০ শতাংশ ডাক্তারকে ওভারটাইম করতে হয়। ওটিও বুক করেন অনেক। আমেরিকার প্রবাসী ভারতীয়রাও বাদ ছিলেন না এতে।

সংখ্যালঘু তোষণ

ভোটের আগে, ভোটের পরেও সংখ্যালঘুদের জন্য দিলদরিয়া মুখ্যমন্ত্রী। তাদের জন্য সুযোগের প্রয়াস চালানোরও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। ১৩ আগস্ট আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরী প্রশিক্ষণ বিভাগের এক অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি ৩৭টি কারিগরী বিষয়ের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। যার মোটা টাকা দিচ্ছে খোদ রাজ্য সরকার। সংখ্যালঘুদের জন্য এই রাজ্যে এতটাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে বামফ্রন্ট সরকার। ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লাও মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পাকিস্তান আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়

আমেরিকা পাকিস্তানকে যতই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সামিল করুক না কেন, তাহাতে ভবি যে ভুলিবার নয়, তাহার প্রমাণ ইতিপূর্বে বহুবার মিলিয়াছে। ভারতের প্রতি পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। সন্ত্রাসবাদীরা পাকিস্তানের মাটিতে বসিয়াই ভারতকে আঘাত করিবার ছক কষিতেছে। প্রমাণাদি সহ ভারত বহুবারই তাহা জানাইয়াছে। কিন্তু পাকিস্তানের তাহাতে কোনও হেলদোল নাই। আমেরিকার ওবামা সরকার পাকিস্তানকে ব্যাপক অর্থ সাহায্য করিয়া আফগানিস্তান সংলগ্ন এলাকায় সক্রিয় তালিবানদের সাফ করিতে ব্যস্ত বটে, কিন্তু ভারতের ব্যাপারে তাহাদের তেমন কোনও সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাইতেছে না।

গত ১৭ আগস্ট দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং পাকিস্তানী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি আবার হামলা চালাইতে পারে বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। দেশের যে কোনও জায়গাতেই এই জঙ্গিরা হানা দিতে পারে। কোনও রাখ-ঢাক না করিয়াই তিনি জানাইয়াছেন, সীমান্ত পার সন্ত্রাসই সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। জঙ্গিদের অত্যাধুনিক অস্ত্র ও প্রযুক্তি মোকাবিলায় তৈরী হইতে হইবে। কথা হইল, প্রধানমন্ত্রীর এই উপলব্ধি কি শার্ম-আল-শেখ-এ সাংঘাতিক ভুলের স্বীকারোক্তি না পাকিস্তানের বিষয়ে নীতির মৌলিক পরিবর্তন। শার্ম-আল-শেখের (মিশর) যৌথ বিবৃতির পর প্রধানমন্ত্রীর দেশে বিরোধীদের তো বটেই, দলের একাংশেরও উষ্মার কারণ হইয়াছিলেন। এইবার সন্ত্রাসবাদীদের হামলার নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের উল্লেখ করিয়া সরকারের কঠোর অবস্থান তুলিয়া ধরিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্বেগে দেশের মানুষের আশংকাই প্রতিফলিত হইয়াছে। শার্ম-আল-শেখের যৌথ বিবৃতিতে পাকিস্তান জঙ্গিদের নিজেদের মাটি ব্যবহার করিতে দিবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেও বাস্তবে তাহা উপেক্ষাই করিয়াছে। তাই চড়া সুরেই পাকিস্তানকে জবাব দিতে হইবে। ইতিহাস বলছে পাকিস্তানকে আদৌ বিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু ঘটনা হইল, দেশের নিরাপত্তাকে বাজী রাখিয়া কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার ভোটের রাজনীতি করিয়া থাকে। গুজরাট সরকার সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলায় গুজরাট কন্ট্রোল অফ অরগানাইজড ক্রাইম (জি সি ও সি) বিলটি বিধানসভায় পর পর চারবার গ্রহণ করিয়া কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠাইলেও তাহা অনুমোদিত হয় নাই। অথচ কংগ্রেস শাসিত মহারাষ্ট্রে ওই একই আইন বহাল আছে। ক্ষমতার লোভে যে কংগ্রেস একদা দেশভাগ স্বীকার করিয়াছে, তাহারা যে ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিতে দেশের নিরাপত্তাকেও বাজী ধরিবে, মুসলিম তোষণ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কী! এখন প্রধানমন্ত্রীর এই চড়া সুর কতদিন বজায় থাকে তাহা দেখিবার। অন্যদিকে দেশের নিরাপত্তা লইয়া বিন্দুমাত্র হেলদোল নাই এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁহার পার্টির। রাজধানীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা লইয়া মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তো যাইবার কোনও প্রয়োজনই বোধ করেন নাই। উপরন্তু রাজ্যের মন্ত্রীসভার কাউকে না পাঠাইয়া পুরো বিষয়টা লঘু করিয়া গোটা তিনেক আমলাকে যেন ভ্রমণের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। বস্তুত ইহা যে আমলাদের রাজধানী ভ্রমণ, দেশের খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্টই জানাইয়াছেন — সম্মেলনটি মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীস্থানীয়দের। তাহারা ব্যতীত আর কেহই ওই সম্মেলনে কোনও বক্তব্য রাখিতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য, দেশের নিরাপত্তা বিষয়ক কোনও বক্তব্য ছিল না পশ্চিমবঙ্গের। প্রশ্ন উঠিয়াছে, দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটি কী এতই গুরুত্বহীন যে আমাদের রাজ্যের কোনও বক্তব্য নাই এবং যে কারণে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজে তো গেলেনই না, এমনকী রাজ্যের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বক্তব্য তুলিয়া ধরিবার জন্য মন্ত্রিসভার কোনও সদস্যকেও পাঠাইলেন না। ইহা কি তাঁহাদের পার্টির সেই দেশ বিরোধিতার পরম্পরা?

পাকিস্তানের সহিত ভারতের দীর্ঘ সীমান্ত। সীমান্ত এলাকার ভারতীয়দের আত্মীয়-স্বজন পাকিস্তানে রহিয়াছে। অন্য কোনও দেশ হইলে এই সম্বন্ধ আরও দৃঢ় করিতেই সচেষ্ট হইত। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিটি সরকারই আত্মীয়তার এই সুযোগ লইয়া শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করিয়া চলিয়াছে। সীমান্তের নিরীহ সাধারণ মানুষ ইহাতে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হইতেছে। জ্ঞানত বা অজ্ঞানত তাহারা মাদক দ্রব্য, নকল নোটের চোরাকারবারী এবং অনুপ্রবেশকারীদের মদতদাতা হইয়া উঠিতেছে।

মুম্বাই-এ ২৬।১১ ঘটনার পর দেশে এখনও পর্যন্ত কোনও সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ঘটে নাই সত্য। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার জন্য নাগরিকদের সচেতনতা অত্যন্ত জরুরী। জীবনের মান বৃদ্ধির জন্য অর্থের প্রয়োজন রহিয়াছে বটে, কিন্তু জীবনের নিরাপত্তা নতুন নতুন ভাবনা ও দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যতীত সম্ভব নয়। দেশের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে এন এস জি হাব গঠনের পরিকল্পনা এই ভাবনারই অঙ্গ। পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের অপারেশনের এলাকা আজ জম্মু-কাশ্মীরের গন্ডী ছাড়াইয়া দেশের সব অংশকেই গ্রাস করিয়াছে। তাই নিরন্তর নজরদারি ও সতর্কতা অপরিহার্য।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আজ আমরা নিজেদের স্বজন অপেক্ষা বিদেশীদের বেশি আপন মনে করি। বাস্তবিক পক্ষে আমরা এত বিভক্ত হয়ে পড়েছি যে নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তার কোনও বন্ধনই অনুভব করি না। ফলে নানা বিরোধে পারস্পরিক শত্রুতার বৃদ্ধি ঘটছে।

— শ্রী গুরুজী।। প্রবন্ধ জাতীয় চরিত্র

সমকামিতা ঃ সংবিধান, আদালত ও ধর্মগ্রন্থগুলির ইঙ্গিত

অমলেশ মিশ্র

গত ২ জুলাই দিল্লী হাইকোর্ট ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারাকে ভারতের সংবিধানের ১৪, ১৫ ও ২১ ধারার আংশিক বিরোধী বলে রায় দিলেন। দিল্লী হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ পি শাহ এবং বিচারপতি এস মুরলীধরের ডিভিসন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছেন।

এই রায় ঘোষিত হওয়ার পর প্রথম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মুসলিম সম্প্রদায়। দিল্লী জুমা মসজিদের ইমাম আহমেদ বুখারী, অল ইন্ডিয়া পার্সোন্যাল ল' বোর্ডের মৌলানা খলিদ রসিদ বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের পক্ষে এ রায় মানা সম্ভব নয়। পরে পরে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহাজনরাও এই রায়ের বিরুদ্ধে বলেছেন। খৃস্টান, শিখ, সনাতনপন্থী (হিন্দু) — কোনও পক্ষই এই রায়কে অনুমোদন করেননি। কেন করেননি বা করলেন না সে নিয়ে পরের আলোচনায় দেখব। আপাতত বলার কথা হলো — এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা হয়েছে।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারায় বলা হয়েছে — Whoever Voluntarily has carnal intercourse against the Order of Nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine.

Explanation : Penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this section.

এর বঙ্গানুবাদ করলে মোটামুটি এইরকম দাঁড়ায় — যদি কেউ প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরুদ্ধে কোনও পুরুষ, নারী বা ইতর প্রাণীর সঙ্গে যৌন সংসর্গ করে তবে তার আজীবন কারাদন্ড হবে অথবা ১০ বছরের জন্য কারাদন্ড হবে, জরিমানাও হতে পারে।

ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যৌন সংসর্গ বলতে পেনিট্রেশন বুঝতে হবে। 'পেনিট্রেশন' ইংরাজী শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ সাহিত্য সংসদের অভিধান অনুসারে — কিছুর ভেতরে বলপূর্বক ঢোকানো, ঢোকা বা বিদ্ধ করা বা ভেদ করা।

দিল্লী হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ যে রায় দিয়েছেন তা হল — We declare Section 377 of Indian Penal Code is so far as it criminalises consensual sexual acts of adults in private violative of Articles 21, 14 & 15 of the constitution. বাংলায় মোটামুটি এইরকম দাঁড়ায় যে, প্রাপ্ত বয়স্কদের পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে ব্যক্তি জীবনে যে যৌন সংসর্গ সাধিত হয় তা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারার আওতায় আনলে ভারতীয় সংবিধানের ২১, ১৪ ও ১৫ নং ধারার বিরোধী হবে, তবে ইতর প্রাণীদের সঙ্গে যৌন সংসর্গ বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে যৌন সংসর্গ বা অসম্মতিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যেও প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সংসর্গ করলে এই রায়ের পরও তা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা অনুসারে অপরাধ বলে গণ্য হবে।

কথিত ৩৭৭ ধারা মূলত সমকামিতা বিষয়ক। অপরাধটিকে 'অস্বাভাবিক অপরাধ' বা unnatural offence বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত নিয়মে অর্থাৎ Order of Nature-এ বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গেই যৌন সংসর্গ হওয়া স্বাভাবিক। সমলিঙ্গের সঙ্গে সম্মতি বা অসম্মতি কোনও অবস্থায়, প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত কোনও বয়সেই যৌন সংসর্গ Order of Nature-এর বিরুদ্ধে বলেই একে 'অস্বাভাবিক অপরাধ' অভিধা দেওয়া হয়েছে। আইনের দৃষ্টিতে এই অপরাধ সাব্যস্ত করতে চারটি প্রমাণ লাগবে।

১। অভিযুক্ত জন যৌন সংসর্গ করেছিল কোনও পুরুষ, নারী বা ইতর প্রাণীর সঙ্গে।

২। এই সংসর্গ প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-এর বিরুদ্ধে।

৩। অভিযুক্ত জন এই কাজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে করেছিল।

৪। ঢোকানো, ঢোকা, বিদ্ধ করা বা ভেদ করা হয়েছিল।

পিছনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ১৩০০ সালে ইউনাইটেড কিংডাম-এ সমকামী অপরাধীদের পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

১৫৩৩ সালে ইংল্যান্ডে অস্বাভাবিক যৌন সংসর্গ আইন, বাগারী এ্যাক্ট প্রণীত হয়েছিল।

১৫৬৩ সালে রাণী এলিজাবেথ একটি সনদ আকারে সমগ্র বৃটিশ রাজত্বে (উপনিবেশগুলিতে) চালু করেন। তবে বাগারী এ্যাক্ট-এ মুখের সাহায্যে যৌন ক্রিয়া বা Oral Sex-কে অপরাধের বাইরে রাখা হয়েছিল।

১৮৬১ সালে সমকামিতার অপরাধে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার আইন বাতিল হয়।

ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ৩৭৭ ধারা ১৫০ বছরের পুরানো। ১৮৬০ সালে লর্ড মেকলে প্রণীত এই দন্ডবিধিতে সমকামিতাকে 'অস্বাভাবিক অপরাধ' হিসাবে গণ্য করে শাস্তির বিধান রাখা হয়।

ভারতবর্ষে সমকামিতাকে আইনসিদ্ধ করার মামলা জনস্বার্থ মামলা হিসাবে প্রথম দায়ের করা হয় ২০০১ সালে। ২০০৪ সালে দিল্লী হাইকোর্টে এই মামলা খারিজ করে। পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হয় ২০০৪ এর নভেম্বরে। এই আর্জিও নাকচ হয়। সমকামীদের সংগঠন ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করে। ২০০৬ সালে সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্টকে মামলা শুরু করার নির্দেশ দেয়। ২০০৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর শুনানী শুরু হয়। আদালত বলে যে, সমকামিতা বিকৃত মনের পরিচয়। কিন্তু মেডিক্যাল ও সাইক্রিয়াটিক রিপোর্ট অনুযায়ী সমকামিতা বিকৃত মনের নয় বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৩ সালে ডায়গনিস্টিক এ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্যাল ম্যানুয়াল অফ মেন্টাল ডিস-অর্ডারের তালিকা থেকে সমকামিতাকে বাদ দেওয়া হয়। তারও আগে ১৯৯২ সালে ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন মানসিক রোগের তালিকা থেকে সমকামিতাকে বাদ দিয়েছিল। ২০০৯ সালের ২ জুলাই দিল্লী হাইকোর্ট সমকামী যৌন সংসর্গকে আইনী স্বীকৃতি দিল।

সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের নেতারা সমকামিতাকে আইন সিদ্ধ করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। মামলাও হয়েছে। তাদের মূল সুর ওই Order of Nature বা প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম — এই প্রসঙ্গ টি। কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের কোনও ধর্মগ্রন্থেই সমকামিতা গ্রাহ্য হয়নি। সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করে যে, মানুষ, প্রকৃতি তথা সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। যৌন সঙ্গম একটি স্বাভাবিক বিষয় এবং সৃষ্টি টিকে আছে এই যৌন সঙ্গমের তত্ত্বের উপর। ঈশ্বর সেইজন্য ইতর প্রাণী, উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, মানুষ সমস্ত জীবের ক্ষেত্রেই পুরুষ ও নারী উভয় লিঙ্গের অস্তিত্ব দিয়েছেন। জন্মদান যদি না থাকে সৃষ্টি থাকে না, আর স্ত্রী-পুরুষ না থাকলে জন্মদান হয় না। জন্মদান-ই হল Order of Nature — বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে যৌন সংসর্গই Ordef of Nature, সমকামিতায় জন্মদান নাই। সমকামিতা তাই Order of Nature-এর বিরুদ্ধে। তাই এটি অপরাধ। এই অপরাধ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্বের বিরুদ্ধে। ঈশ্বর যদি নাও মানেন — প্রকৃতিতে জন্মদান আছে। প্রকৃতিতে জন্মদান-ই Order of Nature, তাই নাস্তিকদের কাছেও সমকামিতা গ্রাহ্য হতে পারে না — এটি গ্রাহ্য করলেই প্রকৃতির প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরোধিতা করা হয়। কারণ সমকামিতায় জন্মদান হয় না।

বিষয়টি যথেষ্ট সঙ্কটে পড়েছে। যেহেতু সমস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রধানরা আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁরা আপত্তি জানিয়েছেন নিজেদের মর্জিতে নয়। তাঁরা প্রত্যেকে যে সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেন — সেইসব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থের ভিত্তিতে। কোনও ধর্মগ্রন্থেই সমকামিতাকে স্বাভাবিক বা ঈশ্বর অভিপ্রেত বলে বলা হয়নি।

অতি অল্প জ্ঞান নিয়েই আমি উল্লেখ করতে চাই যে উপনিষদ, মনুসংহিতা, কোরাণ, বাইবেল, সুফিবাদ, হাদিস, মহাভারত, গীতা, গ্রন্থসাহেব, লাওসে, জরথুষ্ট্র (গাথা) — সর্বত্রই দ্বৈত সত্বা বা duality-র কথা বলা আছে।

সবগুলির উদ্ধৃতি বা ইংরাজী অনুবাদ দিতে গেলে প্রবন্ধ অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। যার উৎসাহী তারা বিস্তৃত ভাবে নাহলেও সংক্ষিপ্তভাবে পেয়ে যাবেন — Essential Unity of All Religion – Bhagvan Das.(Bharatiya Vidya

(এরপর ৪ পাতায়)

সমকামিতা ঃ সংবিধান, আদালত

(৩ পাতার পর)

Bhavan, Kulapati Munsi Marg, Mumbai-400 007) গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠা থেকে ৬৪ পৃষ্ঠায়।

যেখানে সমস্ত মত ও পথের ধর্ম গ্রন্থে এই দ্বিত্ব-র কথা অবিসংবাদিত সত্য হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তা Order of Nature বা প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আদালতের রায় কতটা মানুষকে প্রভাবিত করবে তা ভেবে দেখার বিষয়।

দিল্লী হাইকোর্টের রায় এর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত চেয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এখনও কোনও মতামত দেয়নি। সমস্ত মত ও পথের ধর্মীয় নেতাদের মন্তব্য জানার পর কেন্দ্রীয় সরকার কী মন্তব্য করবেন — তাও বিশেষ ঔৎসুক্যের বিষয়।

কথিত ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ২১ ধারা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধীয়।

১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে আইনের চোখে সমান অধিকারের কথা। অর্থাৎ আইনের চোখে সব ভারতীয় সমান। রাষ্ট্র সকলের ক্ষেত্রে এই সমানাধিকার নীতি মানবেন।

১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ধর্ম সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ অথবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে ভারতীয়দের মধ্যে কোনও বৈষম্য করা যাবে না।

২১ নং ধারায় বলা হয়েছে, আইনের প্রক্রিয়া ব্যতীত কারুরই জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বঞ্চ না করা চলবে না।

সমকামীদের বক্তব্য যে, ১৪ নং ধারা অনুসারে তারা অসমকামীদের সঙ্গে সমানাধিকার পেতে চান। ১৫ নং ধারা অনুসারে তারা সমলিঙ্গ হওয়ার কারণে বৈষম্যের শিকার হবেন না এবং ২১ নং ধারা অনুসারে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা (সমকামিতা) ক্ষুন্ন করা যাবে না।

সমগ্র প্রসঙ্গটি বিচারাধীন থাকায় কোনও বিশেষ মন্তব্য বিধেয় নয়। কিন্তু বহু ধর্ম সম্প্রদায়ের দেশ ভারতবর্ষের কোনও আদালতের রায় যদি সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহের ইঙ্গিত বা বিধানকে নেতিবাচক ভাবে স্পর্শ করে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদালত শেষ পর্যন্ত কী বিচার করেন তা যেমন বিশেষ কৌতুহল ও চিন্তা সৃষ্টি করে তেমনি সংবিধানের উল্লিখিত ধারাগুলি সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে কি-না তাও মননশীল আগ্রহ নিয়ে জানবার ইচ্ছা থাকে।

আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার কী মতামত দেন এবং সর্বোচ্চ আদালত কী মন্তব্য করেন তার উপর।

মন্ত্রী নিজের এলাকতেই ব্রাত্য

(১ পাতার পর)

দালালি করে শ্রমিকদের গাড্ডায় ফেলার ফলও ভুগতে হবে ওই সিটু নেতাকে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে ৮ হাজারেরও বেশি ভোটে পিছিয়ে ছিল সিপিএম। শ্রমিক মহল্লার হতাশাই এর একমাত্র কারণ বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

নৈহাটি অঞ্চলের বিরোধী দল নেতা দ্বিজেন তলাপাত্র বলেন, রঞ্জিতবাবুর মতো অযোগ্য ব্যক্তিকে এত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব দেওয়াটা রাজ্যের উন্নয়ণের বড় প্রতিবন্ধক। তবে রঞ্জিতবাবু এইসব কথায় কান দিতে নারাজ। তার সাফ জবাব, দল এতবড় দায়িত্ব দিয়েছে, এটাই আমার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সুভাষবাবুর অসম্পূর্ণ কাজগুলিই সম্পন্ন করা একমাত্র মূল লক্ষ্য। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের দাবিদার হিসাবে রঞ্জিতবাবু কি যথোপযুক্ত ? না, আসন্ন নির্বাচনগুলির দিকে তাকিয়ে সুভাষ লবির নেতাদের মন পেতে বিমানবাবু রঞ্জিত-তড়িৎবাবুদের আস্থাভাজন হতে চাইছেন ? তবে সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রতীক্ষায় থাকতে হবে।

দিনে যৌথবাহিনী, রাতে মাওবাদী

(১ পাতার পর)

অনায়াসেই কথোপকথনকারীকে চিহ্নিত করা যায়। যেমনটা ক'বছর আগে কলকাতায় ঘটেছিল রোমা ঝাওয়ার অপহরণ-কাণ্ডে। এখন প্রশ্ন উঠছে, মাওবাদীদের মোকাবিলা বা সন্ত্রাসবাদ দমনে রাজ্য সরকার কি আদৌ ইচ্ছুক ?ঘটনা হলো, সম্প্রতি দিল্লীতে মাওবাদ ও সন্ত্রাস দমনে কৌশল স্থির করতে মুখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে অসুস্থতার কারণে বুদ্ধ বাবু যেতে পারেননি। কোনও বরিষ্ঠ মন্ত্রীকে সেখানে না পাঠিয়ে শুধু অফিসারদের পাঠিয়েই কর্তব্য সেরেছেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম্ ও ডঃ মনমোহন সিং এতে অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা হলো, আগে থেকে বলে-কয়ে গত ১৭ আগস্ট লালগড় ব্লকের গোহমীডাঙ্গায় ছত্রধর মাহাতোর সভা। যৌথবাহিনী পথে অবরোধ খাড়া করে এবং সভার মঞ্চ ভেঙে মাইক তুলে নিয়ে গেলেও ছত্রধর দলবল নিয়ে দেড়ঘন্টা ধরে ভোলাগাড়ায় জোরালো সভা করে ২৩ দফা দাবী পেশ করে।

মাত্র দেড় কিমি দূরে ভোলাগাড়ায় সভা হলেও যৌথবাহিনী সেখানে যেতেই সাহস করেনি।

ঘটা করে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা হেলিকপ্টার চড়ে লালগড়ে গিয়ে উন্নয়ণের ফুলঝুরি ছড়ালেও কোনও কাজই শুরু হয়নি এখনও। উল্টে রামগড় ও ধরমপুর পঞ্চায়েত অফিস মাও-হুমকীতে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। যৌথবাহিনী এখন বলছে উন্নয়ণ না হলে, মাওবাদী ও তাদের প্রকাশ্য সমর্থক জনগণের কমিটির জনসমর্থনে চিড় ধরানো যাবে না। যৌথবাহিনী গ্রামে গ্রামে ঢুকে সাধারণ মানুষজনকে বেধড়ক পিটিয়েছে। তাতেও সাধারণ মানুষ সরকারের ও সরকারি দলের বিপক্ষে চলে গিয়েছে। লালগড়, শালবনী ও মেদিনীপুর সদর ব্লকের লক্ষ্মণপুর, ধেড়ুয়া, সিজুয়া, মেমুল, ধরমপুর, তাড়কীলাটা, পূর্ণাপানি, চাঁদাবিলা, বৃন্দাবনপুর, নাড়চা প্রভৃতি গ্রামে চলছে মাওবাদীদের রমরমা। যৌথবাহিনী নামানোর পরও শাসকদলের ক্যাডার হত্যা ও অপহরণ কমেনি। স্বরাষ্ট্র সচিবের বয়ান অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত ৬৭ জনকে ধরা হয়েছে। হয়তো তাদের মাওবাদী তকমা দিয়ে আটকে রাখা হবে। তবে তাদের মধ্যে একজনও যে হার্ডকোর মাওবাদী নেই তা ওয়াকিবহাল মহল জানেন। যদিও স্বরাষ্ট্র সচিব বলেছেন, এদের মধ্যে পঁচিশজন হার্ডকোর মাওবাদী।

সব মিলিয়ে ৩২ বছরের দীর্ঘ অনুন্নয়ণ, দলীয় ক্যাডারদের দাপটে এলাকা শাসন আজ শাসক দল, সরকার ও প্রশাসনের ভিত নড়িয়ে দিয়েছে। সেই সুযোগটাই নিয়েছে মাওবাদীরা। তাদের জনসমর্থন ও প্রভাবিত এলাকা বেড়ে চলেছে। সহজে যে এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে রাজ্য সরকার।

৫৯ শতাংশ পাকিস্তানী আমেরিকার বিরুদ্ধে

(১ পাতার পর)

ওই নমুনা জনমত সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে পছন্দ করেন ৩৮ শতাংশ পাকিস্তানী, যা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী। এসময়ে পাকিস্তানীদের কাছে নওয়াজ শরীফই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য জনপ্রিয় নেতা। যেখানে মাত্র ১৩ শতাংশ পাকিস্তানী বর্তমান পাক প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানী এবং নয় শতাংশ পাকিস্তানী আসিফ আলি জারদারিকে পছন্দ করেন। মাত্র আট শতাংশ পাকিস্তানী সেনাশাসনকে বর্তমান পাকিস্তানের পক্ষে ভালো বলে মনে করেন।

তালিবানদের উত্থানকে আমেরিকা, ভারত-এর থেকে কম ক্ষতিকর মানলেও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তালিবান বিরোধী অভিযানকে মাত্র ২৪ শতাংশ পাক নাগরিক বিরোধিতা করেছেন। অর্থাৎ ৪১ শতাংশ পাকিস্তানী তালিবানদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযানের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বাকিদের ২২ শতাংশ নিরপেক্ষ থেকেছেন এবং শতকরা ১৩ জন বলেছেন, তারা এবিষয়ে কিছু জানেন না। নমুনা সমীক্ষায় শতকরা ৪৮ জন ছিলেন মহিলা, ৫৩ শতাংশের বয়স ছিল ৩০ থেকে ৫০ বছর এবং ৩৯ শতাংশের বয়স ছিল ৩০ বছরের মধ্যে। এই সমীক্ষার বৈশিষ্ট্যই ছিল সমীক্ষকরা মুখোমুখি প্রশ্ন করে উত্তর জেনেছেন, অর্থাৎ এক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত মোবাইল-এর এস এম এস বা ওয়েবসাইট ব্যবহার করা হয়নি। দেখা যাচ্ছে, কোটি কোটি ডলার অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও আমেরিকা পাকিস্তানবাসীদের মন জয় করতে পারেনি।

শিক্ষা নিচ্ছে মাওবাদীরা

(১ পাতার পর)

কথা লেখা রয়েছে। বলা হয়েছে এল টি টি ই-র পরিণতি মাথায় রাখার কথাও।

'আশু কর্তব্য' শীর্ষকে দলের সশস্ত্র শাখাকে কৌশলী কাউন্টার আক্রমণ বিষয়ে শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করার কথা রয়েছে। আক্রমণ সুসংগঠিত, খুঁটিনাটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার সঙ্গে খাঁকী পোষাক ও অলিভ সবুজ পোষাকের বাহিনীকে সন্ত্রাসী বাহিনী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্পেশাল পুলিশ ফোর্স ও পুলিসের ইনফর্মারদের প্রতিবিপ্লবী এবং জনশত্রু বলে অভিহিত করা হয়েছে। আক্রমণের সময়ে দলের সশস্ত্র বাহিনীকে দলের জনভিত্তি অর্থাৎ জনসাধারণের সশস্ত্র সমর্থনকেও কাজে লাগাতে বলা হয়েছে। এর সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, জনভিত্তিকে প্রসারিত করে নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, তিনটি বিষয়কে সংযুক্তভাবে আক্রমণের সময়ে সদ্ব্যবহার করতে হবে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করার জন্য। নতুন প্রত্যাঘাতকে প্রতিহত করতে জনযুদ্ধের সুফলকে সুরক্ষিত রাখা, দেশজুড়ে জনজাগরণ কর্মসূচী রূপায়ণ করতে দণ্ডকারণ্য (ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশ), বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং অন্যান্য স্থানের লড়াইকে তুলে ধরতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডকারণ্য হল ছত্তিশগড় প্রদেশের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ বস্তার অঞ্চল এবং ভারতের সর্বাপেক্ষা ঘন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা। পুলিশ কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে, ওই গভীর জঙ্গলের ভিতরেই পার্বত্য এলাকায় মাওবাদীদের সৈনিক হেডকোয়ার্টার এবং নেতাদের আত্মগোপন করার গুপ্তস্থানও আছে। নথিতে বার বার এল টি টি ই-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীতে দীর্ঘকাল যাবৎ চলতে থাকা এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী আন্দোলনের অবসান ভারত, দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্বের বিভিন্ন সন্ত্রাসী আন্দোলনকে প্রভাবিত করবে বলে বলা হয়েছে। এল টি টি ই-র ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেবার কথা বার বার বলা হয়েছে। এল টি টি ই-এর ভুল হল — শত্রুর কৌশল বদল বুঝতে পারেনি। শত্রুকে খাটো করে দেখেছে, নিজেদের শক্তি সামর্থ্য নিয়ে বড় বেশি করে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল।

সি পি আই (মাওবাদী) নেতৃবৃন্দ তাদের গেরিলাদেরকে সরকার বা শত্রুশক্তিকে অসুবিধার মধ্যে ফেলার জন্যে গেরিলাযুদ্ধে জনগণের অংশগ্রহণ, নতুন নতুন যুদ্ধ ক্ষেত্র তৈরী করে সরকারি বাহিনীকে তাদের এলাকায় টেনে আনার নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে দলীয় নেতাদের সুরক্ষিত রাখা, ক্যাডারদের বহাল রাখা এবং অযথা অপ্রয়োজনীয়ভাবে শক্তিক্ষয় বা লোকক্ষয় এড়িয়ে চলার কথা বলা হয়েছে। মাওবাদী নেতৃত্ব চায় প্রচলিত পদ্ধতির দুর্বলতা সংশোধন করে নিতে।

একইসঙ্গে নিজেদের বিষয়টা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য নানান পদ্ধতি অবলম্বন করে। শত্রুপক্ষীয় লোকজনকে বিশ্বাসঘাতক চিহ্নিত করে দলীয় রেকর্ডে ধরে রাখা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক কয়েক মাসে সি পি আই মাওবাদীরা অত্যন্ত আক্রমণাত্মক হয়ে ছত্তিশগড় এবং অন্যান্য রাজ্যে বহু সংখ্যায় পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তাবাহিনীকে হত্যা করেছে।

'চীনের চেয়ারম্যান (মাও জে দং) আমাদের চেয়ারম্যান' স্লোগান দিয়ে ১৯৬৭ সালে উত্তরবঙ্গের অখ্যাত নকশালবাড়ি গ্রাম থেকে মাওবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। সেজন্য তাদের নকশাল বলে চিহ্নিত করা হয় তখন থেকেই। তখন শত শত নকশালপন্থীদেরকে সরকারি বাহিনী হত্যা করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন অবদমিত হলেও অন্যান্য রাজ্যে তা ছোট আকারে চালু ছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্যত্র আন্দোলন ও তথাকথিত নকশালপন্থী চিন্তাধারা ছড়িয়েছিল। এখন স্রোত বিপরীতমুখী।

অন্যান্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ বাম জমানার বিফলতার ফাঁক দিয়ে ঢুকে বিরাট আকারে দেখা দিয়েছে। এখন আর নকশালবাড়ি বা পশ্চিমবঙ্গে মাওবাদীরা সীমাবদ্ধ নেই। মাওবাদীদের ব্যাপকতা অনেক রাজ্যে স্থানীয় সরকারের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তারা এখন গেরিলা কায়দায় সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়ে দেশের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করার স্বপ্ন দেখছে। রাজ্যে রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনী মাওবাদী সন্ত্রাস দমনে যতই বিফল হচ্ছে তাদের মনোবল ততই বেড়ে চলেছে।

জঙ্গিদের মদত দিচ্ছে পাকিস্তান

(১ পাতার পর)

সন্ত্রাসবাদীরা। তাদের দাবী ছিল ভারতে বন্দি মাসুদ আজহার সহ তিন জইস জঙ্গিকে মুক্তি দিতে হবে। এই দাবী জানাবার আগেই তারা এক যুবক যাত্রীকে অকারণে হত্যা করে। ঘোষণা করে যে তাদের দাবী না মানলে ঠিক এইভাবে সকলকেই হত্যা করতে হবে। নিরপরাধ বিমানযাত্রীদের প্রাণরক্ষার জন্য কেন্দ্রের তৎকালীন এন ডি এ সরকার তিন জইস জঙ্গিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে ভারত আরও চেয়েছে যে লস্কর-এ-তৈবার জঙ্গি নেতা আব্দুল রহমান লাক্ভিকে-ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হোক। এই লাক্ভি মুম্বাইয়ে রেল বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রধান মাথা ছিল। ভারতের স্পষ্ট বক্তব্য, ইউ এন ও-র বৈঠকে অনুমোদিত ১২৬৭ নম্বর প্রস্তাবে আল কায়দা ও সহযোগী অন্যান্য তালিবানি জঙ্গি সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। লস্কর আল কায়দার একটি শাখা সংগঠন। তাই লস্করের জঙ্গিদেরও নিষিদ্ধ বলেই ধরতে হবে। কিন্তু চীনের বাধায় আন্তর্জাতিকভাবে লস্করের বিরুদ্ধে ও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। একইভাবে চীনের আপত্তিতে কুখ্যাত ইসলামি জঙ্গি গুপ্ত সংস্থা জামাত-উদ্-দাওয়া ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে এক সময়ে আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছিল না। এই জেহাদি সংস্থার প্রধান হাফিজ সইদ ও জাকিউর রহমান লাকভিকে আন্তর্জাতিক অপরাধীদের কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে গত বছর। কারণ, এদের আন্তর্জাতিক কালো তালিকাভুক্ত অপরাধী ঘোষণায় চীনের আপত্তি ছিল। কিন্তু এই গুপ্ত জঙ্গি সংস্থা যেহেতু মার্কিন দেশেই বেশি সক্রিয় তাই আমেরিকার চাপে বাধ্য হয়ে চীন সম্মতি দিতে বাধ্য হয়। এশিয়ায় চীন তার প্রধান শত্রু ভারতকে দাবিয়ে রাখতেই ইসলামি জঙ্গি দের নাশকতাকে হাতিয়ার করতে চাইছে।

রাজ্য রাজনীতি

সি পি এম তলিয়ে যাচ্ছে

নিশাকর সোম

রাজ্য সিপিএম-এর এখন ছন্নছাড়া অবস্থা। প্রশাসনিক কর্তারা মন্ত্রীদের তেমন গ্রাহ্য করছেন না। ঘটনা হলো, শিল্প-সচিব সব্যসাচী সেন তৃণমূলের অঘোষিত পত্রিকার অনুষ্ঠানে হাজির থেকে সেই কাগজটির ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই কাগজটি প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছত্রে ছত্রে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচনা করে থাকে। এই সব্যসাচী সেন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজে বদলি হতে চেষ্টা করছেন বলে শোনা যাচ্ছে। পুলিশ-কর্তাদেরও একাংশ এই সরকারের কাজ ছেড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজে যেতে চাইছেন।

বামফ্রন্টের এক শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের এক নেতার প্রাসাদোপম বাড়ির তোলার কাহিনী কাগজে ছবিসহ বেরিয়েছে। ঠিক সিপিএম-এর লালগড়ের নেতা অনুজ পান্ডের বাড়ির মতো। ফরওয়ার্ড ব্লকের এক নেত্রীর নেতৃত্বে বারাসাতের প্রশাসনিক কার্যালয় ভাঙচুর করে এবং তার ছবিও সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। বামফ্রন্টের আর এক শরিক আর এস পি শ্রমিক নেতা অশোক ঘোষ একটি নব্য প্রকাশিত ইংরাজি নামের বাংলা দৈনিকে বামফ্রন্ট তথা সিপিএম-এর সমালোচনা করে থাকেন। আর এস পি-এর কৃষক নেতা অশোক চৌধুরীও ওই পত্রিকায় লেখেন। আর এস পি বস্তুত সিপিএম-এর বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে।

বামফ্রন্টের আর এক শরিক সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন রাজ্য সিপিআই-এর নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সাধারণ সভায় বলেছেন যে, সিপিএমে নেতৃত্ব ও নীতির পরিবর্তন না হলে বামফ্রন্টের ঐক্য থাকবে না।

সর্বশেষ একটি কান্ড চিড়িয়াখানায় বাঁদর চুরি! কী সুন্দর রাজ্য পুলিশ প্রশাসন! সম্পূর্ণ ব্যর্থ পুলিশ মন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য। এই রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পদকএবং রবীন্দ্র জায়ার গহনা চুরি থেকে সম্প্রতি চিড়িয়াখানার বাঁদর চুরি পর্যন্ত ঘটনায় রাজ্য কালিমালিপ্ত হয়েছে।

রাজ্য সিপিএম-এর এখন নাকি ‘শুদ্ধি করণ” অভিযান করা হবে! সম্প্রতি খবরে জানা গেল, বর্ধমান জেলাতে নাকি ২০ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কাদের বহিষ্কার করা হয়েছে? যাঁরা ভোটে পার্টির বিরুদ্ধ তা করেছেন তাঁদেরকেই বহিষ্কার করা হয়েছে। আসলে পার্টি নেতার বিরুদ্ধ তা করার দরুণ বহিষ্কার। কমিউনিস্ট পার্টিতে চিরদিনই পার্টি নেতৃত্বের বিরোধীরাই বহিষ্কৃত হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সিপিএম তথা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে “অনৈতিক ” কাজ সম্বন্ধে কোনও নির্দেশিকা ছিল না। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে এমন ঘটনাও বিরল নয় যে — পুত্র সৎমা-কে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল। তদানীন্তন পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি অজয় ঘোষ এই ঘটনার নিন্দা করেছিলেন। এমন ঘটনাও বিরল নয় যে বৌদিকে বিয়ে করাটাও চলেছিল। শোনা যায় পার্টি নেতৃত্ব এসব সমর্থন করেছিলেন।

এই সেদিন সিপিএম-এর এক মন্ত্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলী, গায়ে মদ ঢেলে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর স্ত্রী পার্টিকে বহু অভিযোগ করেছিলেন!

কিছুদিন আগে এস ইউ সি পার্টির নেতা বিধান চ্যাটার্জি আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর স্ত্রীও অভিযোগ করেছিলেন। আবার বিধান চ্যাটার্জিও পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এক গোছা অভিযোগ লিখে গেছেন।

মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা রেলওয়েতে মুসলিমদের ৩০ শতাংশ চাক্‌রী দেবার দাবী তুলেছেন। এটা কি সাম্প্রদায়িকতা নয়? যত দোষ নন্দ ঘোষ — বিজেপি’র? তাই শুদ্ধি করণ করতে গেলে পার্টি ও প্রশাসনের উপর তলার নেতাদের শুদ্ধি করণ বা বহিষ্কার করা দরকার।

এসবের কারণ একটাই — ভোগবাদী দর্শনে কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে।

কমিউনিস্ট পার্টিতে সিপিএম-এবং বামফ্রন্টের পার্টিগুলির মধ্যে সরকারি ক্ষমতা পাওয়ার পাঁচ দশ বছরের মধ্যেই কামিয়ে নেওয়ার নীতি প্রচলিত হয়। পার্টিগুলি কোনটি অনৈতিক কাজ তার কোনও নির্দেশিকা ঠিক করেনি। উপরন্তু নেতাদের পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ উক্তি অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়াতে উৎসাহ যুগিয়েছে। যেমন যখন বিনয় চৌধুরী বলেছিলেন প্রমোটারদের সরকার, তখন জ্যোতি বসু বলেছিলেন — বিনয়বাবু মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিন। বিনয়বাবু স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি বিপিন গাঙ্গুলীর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। তখন জ্যোতিবাবু সোনার চাম্‌চে মুখে দিয়ে লালিত হয়েছিলেন। হ্যাঁ — বিনয়বাবু ‘বিলেত ফেরত” ছিলেন না। তাই জ্যোতিবাবুর এইরূপ রূঢ় মন্তব্য। আবার নৃপেন চক্রবর্তী জ্যোতি বসুকে সমালোচনা করার দরুণ পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। অথচ এই নৃপেন চক্রবর্তী অবিভক্ত পার্টিতে জ্যোতি-প্রমোদের নেতা ছিলেন। পার্টির বেআইনী যুগে “নিতাই” নামে খ্যাত ছিলেন।

আর একটি ঘটনা জানা যাচ্ছে যে জ্যোতিবাবু যখন পার্টি ভাগের সময়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে একটি পত্রিকা বের করেন সেই পত্রিকার একজন কর্মকর্তা — যিনি জ্যোতি বসুর অনুসারী ছিলেন, ১৯৭৭ -এর পর তাকে একটি সংস্থার কর্মকর্তা করা হয়। জ্যোতি অনুগামী সেই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পার্টিতে উঠলে, জ্যোতি বসু নাকি সরাসরি বাতিল করে দিয়ে বলেছিলেন — “করে খাচ্ছে, কি করা যায়?”

বিমান বসু বারংবার বলছেন, ধান্ধাবাজদের তাড়াতে হবে। পার্টিতে ধান্ধাবাজি শুধু আর্থিক নয়, পদলোভও ধান্দাবাজি। আর এই পদলোভ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতেও ছিল। একটি ঘটনার কথা পীযূষ দাশগুপ্ত বলেছিলেন — সিপিএম-এর কলকাতা জেলার সম্পাদক তথা রাজ্য কমিটিতে উন্নীত নেতা লক্ষ্মী সেন নাকি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের মনোনয়ন না পেয়ে পার্টি থেকে পদত্যাগ পত্র দিয়েছিলেন। পীযূষবাবুকে কলকাতা জেলা সিপিএম “কংগ্রেসিদের সঙ্গে হব-নব” করার ‘অপরাধে’ বহিষ্কার করেন। কিন্তু লক্ষ্মী সেন বেলগাছিয়ার তদানীন্তন কংগ্রেসি বিধায়ক নন্দ ব্যানার্জি-এর সঙ্গে যৌথ পদযাত্রা করে পার্টির সমর্থন পেয়েছিলেন। পীযূষবাবু একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রমোদ দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে লিখে শাস্তি পান। কিন্তু তাঁকে এই লেখার ব্যাপারে মাল-মশলা ছবি দিয়ে যে বা যাঁরা সাহায্য করেছিলেন — সেই ব্যক্তি নাকি এখন উচ্চ সরকারি পদে উন্নীত হয়েছেন। আর একটি উদাহরণ — দেশহিতৈষীর কর্মী তারাপদ মিত্র জন্মভূমি নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করে বহিষ্কৃত হন। আর তাঁকে যিনি এ কাজ করতে সাহায্য করেছিলেন সেই “কমরেড” সরকারি উচ্চপদে আসীন আর তারাপদবাবু ক্যানসার রোগে বিনা চিকিৎসায় মারা যান।

আসলে নেতৃত্বের পক্ষে যদি থাকা যায় এবং পার্টির মধ্যে উপদল গড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে পারা যায়, তাহলেই তিনি সৎ কর্মী। যো জিতা ওহি সিকান্দার। এই ট্রাডিশন আজও চলেছে। মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা রেলওয়েতে ৩০ শতাংশ মুসলিমদের চাক্‌রী দেবার দাবী তুলেছেন। এটা কি সাম্প্রদায়িকতা নয়? যত দোষ নন্দ ঘোষ — বিজেপি’র?

তাই শুদ্ধি করণ করতে গেলে পার্টি ও প্রশাসনের উপর তলার নেতাদের শুদ্ধি করণ বা বহিষ্কার করা দরকার। নতুবা নীচের তলার পার্টি কর্মীদের শুদ্ধ করা যাবে না।

অ ঢে রকম

বীনের জাদু

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ওরা গান করে। অন্যকে আনন্দ দেয়। নিজেরাও আনন্দ পায়। কিন্তু এই গান মুখে নয়। বীন বাজিয়ে। কারণ ওরা সাপুড়ে। তাহলে গান কেন! না কোনও সাপকেই ওরা কষ্ট দিতে চায় না। তাছাড়া বন্যেরা বনেই সুন্দর। তাই নগর জীবনে সাপ টেনে আনার পক্ষপাতী ওরা নয়। বীন বাজিয়ে গান করাটাই ওদের বেশি প্রিয়। খোদ দিল্লীর বুকে ওরা গড়ে তুলেছে ‘অর্কেস্ট্রা টিম’। যোগীনাথ সমাজ নামে ওরা প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেদের দলের অস্তিত্ব। ‘বেগার অপেরা’ নামে এই অর্কেস্ট্রাই ওদের মেলে ধরেছে দেশজুড়ে। সত্তর জনের এই অপেরাটি শুধু রাজধানী নয়, অন্যান্য রাজ্যের রাজ্যবাসীরও মন কেড়েছে। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ থেকে সাপুড়েরাও যোগীনাথ সমাজের মেম্বার হয়েছে।

‘বেগার অপেরা’ যখন মঞ্চে উঠে বীন বাজায়, তখন তাবড় অর্কেস্ট্রা পার্টি তা শুনে থ হয়ে যায়। খোদ মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতও বীন শুনে মুগ্ধ হয়ে ছিলেন। শীলা দীক্ষিতের মতো অনেকেই বীনের টানে ছুটে আসেন। তবে শুধু বীন নয়, বীনের পাশাপাশি থাকে খঞ্জনি আর ঢোল।

এইচ এম ভি সারেগামার মতো রেকর্ড কোম্পানীও বেগার অপেরার সিডি বের করেছে।

বাবা ভোলানাথের গলায় সাপের বাস, এই ভেবেই ওরা ঠিক করেছিল মহাদেবের কন্যাকে নিয়ে ছেলে খেলা নয়। তাই শুরু থেকেই যোগীনাথ সমাজ বীন বাজিয়ে গানের ব্যবসার পথ ধরেছে। বীন বাজিয়ে মোটা টাকা পায় ওরা। সেই সঙ্গে খ্যাতি-যশও। সবশ্রেণীর মানুষই ওদের বীন শুনতে ভালোবাসেন।

বেগার অপেরার সাপুড়েরা।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিরা দক্ষিণে লুকিয়ে রয়েছে

সংবাদদাতা ।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষত অসমে সক্রিয় বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর জঙ্গিরা বর্তমানে নিরাপত্তা বাহিনীর চাপে এবং তাড়া খেয়ে দক্ষিণে ভারতের নতুন নতুন ডেরায় লুকিয়ে রয়েছে। খোদ অসম পুলিশের মহানির্দেশক জি এম শ্রীবাস্তবের (বর্তমানে প্রাক্তন) এই মন্তব্য করেন।

উল্লেখ্য, উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায় সক্রিয় উগ্রপন্থী ব্ল্যাক উইডো গোষ্ঠীর সুপ্রীম কমাণ্ডার জুয়েল গার্লোসা গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই বাঙ্গালোর শহরের এক অভিজাত জিমনাসিয়াম থেকে ধরা পড়ে। পরে কর্ণাটক পুলিশের সাহায্যে অসম পুলিশ তাকে নিয়ে আসে।

শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, বেআইনী ঘোষিত উলফা এবং এন ডি এফবি-এর প্রথম সারির জঙ্গি নেতারা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন শহরে গা ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করে আছে। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে বলে শ্রীবাস্তব দাবী করেছেন। নিরাপত্তার কারণে নির্দিষ্ট স্থানের নাম অবশ্য বলতে চাননি শ্রীবাস্তব। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে অসম পুলিশ।

জুলাই মাসের গোড়ার দিকেই মণিপুরে সক্রিয় জঙ্গি সংগঠন (ইসলামি এবং জিহাদি) পীপুলস্ ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট-এর নেতা রোশন ওরফে আনীসকে ব্যাঙ্গালোরের মহাদেবপুরার নিকটবর্তী সিঙ্গানাপালয় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেখানে সে সিকিউরিটি গার্ডের কাজে যোগ দিয়েছিল। 'পালফ' যে মুসলিম জিহাদি গোষ্ঠী এটি মণিপুরে সবাই জানে। গত বছর অন্যতম মণিপুরী জঙ্গি গোষ্ঠী প্রিপাক (পীপুলস্ রিভলুশনারি পার্টি অফ কাংলেইপাক)-এর তিনজন জঙ্গি এবং তাদের তিনজন সহযোগীকে পুলিশ

ব্যাঙ্গালোর থেকে ধৃত গার্লোসা।

ব্যাঙ্গালোর থেকেই গ্রেপ্তার করেছিল। তারা ব্যাঙ্গালোর শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে কাগ্গাদাসপুরাতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছিল। যখনই নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা বাড়ে তখনই উগ্রপন্থীরা দক্ষিণে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকে। নতুন প্ল্যান করে। মণিপুরের একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের কথায়— তাঁরা উগ্রপন্থীদের এই ছক অনেকটা অনুমান করতে পারছেন। উত্তর-পূর্বের গোয়েন্দাদের মতে, বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ এবং চেন্নাই বাদে আরও দুটি নির্দিষ্ট স্থানেও জঙ্গিরা গা ঢাকা দিয়ে আছে বলে তারা জানেন। তবে সেইসব স্থানের নাম জানাতে তারা রাজী হননি।

মালদা সীমান্তে রমরমিয়ে চলছে অবৈধ সিমকার্ডের ব্যবহার

সংবাদদাতা মালদা ।। মালদা জেলাসহ দুই দিনাজপুরে বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্তে রমরমিয়ে চলছে অবৈধ সিমকার্ডের ব্যবহার। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি থানার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বাংলাদেশের মোবাইল সেট সহ সিমকার্ড ব্যবহার রমরমিয়ে চলছে বলে স্থানীয় মানুষরা অভিযোগ করেছেন। একই ব্যক্তি একসঙ্গে চার পাঁচ রকমের সিম কার্ড ব্যবহার করছে এবং ভারতীয় এলাকার মধ্যে ৮-১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাংলাদেশী সিমকার্ড ব্যবহার করতে অসুবিধা হচ্ছে না। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার ফলে অবৈধ সিমকার্ডের ব্যবহারও বাড়ছে। চোরাকারবার ও অপরাধমূলক কাজে সিমকার্ড ব্যবহার হচ্ছে। মালদার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ইংলিশবাজার, কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর, পুরাতন মালদা, হবিবপুর থানার বিভিন্ন গ্রামগুলিতে রুপো ও খুচরো পয়সার পাচারচক্র সক্রিয়। গত ৫ আগস্ট গভীর রাতে কালিয়াচক থানার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী শ্মশান থেকে পাঁচ কেজি রুপোর গয়না এবং মূল্যবান পাথর ভর্তি একটি ব্যাগ বি এস এফ উদ্ধার করে। এছাড়া ইংলিশবাজার থানার কৃষ্ণপুর গ্রাম থেকে রুপোর গয়না উদ্ধার হয়েছে। খুচরো পয়সাও বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। এই পয়সা থেকে বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে রুপোর গয়না যা বাংলাদেশে প্রচুর দামে বিক্রি হচ্ছে। ঘটনাগুলির সাথে আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের যোগাযোগ আছে বলে পুলিশের ধারণা। এই গয়নাগুলি পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ লাগোয়া জেলাগুলির বিভিন্ন মন্দির থেকে চুরি করে আনা হয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। পুলিশ সুপার বলেছেন, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনজনের খোঁজ চলছে।

বি এস এফ যদিও বলছে স্বাধীনতা দিবসের আগে বর্ডার সীল করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারাই আবার সতর্ক করে দিচ্ছে মালদা জেলার বামনগোলা সংলগ্ন বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে জঙ্গিরা এপারে ঢুকতে পারে। জেলার বামনগোলা ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বেশ কিছু এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়নি। এখানে দু'দেশের সীমান্ত দিয়ে বইছে পুনর্ভবা নদী। মাস ছয়েক আগে এখান দিয়েই এক জঙ্গি ভারতে ঢুকেছিল। সে কাশ্মীরে গিয়ে সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। বি এস এফ সূত্রে জানা গেছে, মহিলা জঙ্গিদের নিয়ে ১০-১২ জনের একটি দল ওপারে জড়ো হয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে তারা এপারে ঢুকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিএসএফের কমাণ্ডান্ট বলেছেন, জঙ্গি অনুপ্রবেশ রুখতে বোট নিয়ে টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু অন্য সীমান্ত দিয়ে এপারে জঙ্গি ঢুকলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। :

মৌলবাদের আগে 'ইসলাম' শব্দ নিয়ে উত্তপ্ত অসম

সংবাদদাতা ।। সম্প্রতি অসম রাজ্য বিধানসভায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল। প্রশ্নোত্তর পর্বে অসম গণ পরিষদ দলের বিধায়ক প্রবীণ বরো জানতে চান, 'এ সময়ে অসমে কতগুলি ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠী সক্রিয়? মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষ থেকে উত্তর দেন রাজ্যের বনমন্ত্রী রকিবুল হুসেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, দুটি ইসলামি মৌলবাদী গোষ্ঠী সক্রিয় — মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম এবং হরকত উল মুজাহিদিন। তখনই একজন এ ইউ ডি এফবিধায়ক আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন, 'ইসলামি' মৌলবাদী শব্দে তার আপত্তি আছে। বলতে হবে শুধু মৌলবাদী। 'মৌলবাদী'-র আগে ইসলামকে জোড়া যাবে না। ব্যাস্।

এরপরই হৈ চৈ বেঁধে যায়। দলের অন্যান্য এম এল এ-রাও ওই এ ইউ ডি এফ বিধায়ককে সমর্থন করতে থাকেন। সুরে সুর মিলিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে গলা ফাটান কংগ্রেস, অগপ সহ সব দলেরই মুসলিম বিধায়করা — মহিবুল হক, আব্দুর আজিজ, লিয়াকত আলি (এ জি পি)। প্রত্যেকের এক কথা — 'মৌলবাদী' শব্দের আগে ইসলাম শব্দ বসানো যাবে না।

এমনকী খোদ মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈও একই আপত্তি তোলেন। তাঁর বক্তব্য, টেরারিস্টদের কোনও জাত-ধর্ম নেই। অগপ বিধায়ক দল নেতা চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, 'ইসলামিক' শব্দটি কোনও অসাংবিধানিক শব্দ নয়। মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান মৌলবাদীদেরকেই সমর্থন যোগাবে। এটা একরকম মৌলবাদীদের সঙ্গে আপোশ করার সামিল। প্রত্যুত্তরে গগৈ জানান যে, তিনি কখনও মৌলবাদীদের সঙ্গে আপোশ করেননি এবং ভবিষ্যতেও করবেন না। বিজেপি বিধায়ক রণজিৎ দত্ত সংখ্যালঘু বিধায়কদের বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উত্তরের সময় তো বরাবর 'মৌলবাদী' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। তখন তারা প্রতিবাদ করেননি কেন? স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানান, আজকের কার্যবিধি থেকে মৌলবাদী শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তা ব্যাখ্যা করেছেন।

নির্দল বিধায়ক ভূপেন পেগু বলেন, “সন্ত্রাসবাদীরা সারা পৃথিবীকেই রক্তরঞ্জিত করছে, আমরা একটি বিশেষ ধর্মমতের দোহাই দিয়ে কঠিন বাস্তবকে অস্বীকার করছি কেন? আমরা যদি ইসলাম শব্দটি বাদও দিই তাহলেও সন্ত্রাসবাদের উপর তার কোনও প্রভাব পড়বে না। সি পি আই বিধায়ক ধ্রুপদ বরগোহাঞি বলেন, ইসলামি মৌলবাদীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কোনও নতুন ঘটনা নয়। তাহলে আমরা বাস্তবকে অস্বীকার করে 'ইসলামিক' শব্দ ব্যবহার করব না কেন?

তরুণ গগৈ

হিমন্তবাবু তখন উলফা'র আগে 'হিন্দু' বসানোর প্রস্তাব দেন।

বিরোধী দলনেতা চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি আবার হস্তক্ষেপ করেন। তিনি বলেন, “আমরা সহমত যে, টেরারিস্টদের কোনও ধর্ম নেই। কিন্তু যারা ধর্মের নামে সারা পৃথিবীকে সন্ত্রাসে জর্জরিত করছে, তাকে অস্বীকার করব কীভাবে?”

মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ আবারও বলেন, “আমরা যখন 'বোড়ো মিলিট্যান্ট' বা 'কার্বি মিলিট্যান্ট' শব্দ ব্যবহার করি তখন তা সম্পূর্ণভাবে বোড়ো বা কার্বি সমাজকে বোঝায় না।

তারপর দলমত নির্বিশেষে সব মুসলমান এম এল এ -ই সমস্বরে 'ইসলামি মৌলবাদী' শব্দ ব্যবহারে করা যাবে না বলে প্রতিবাদ জানান। এরপর বিধানসভার লবিতে চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি আবার সাংবাদিকদের বলেন 'ইসলামিক' শব্দটি মোটেই অসাংবিধানিক নয়। কারণ, ইসলামি মৌলবাদীদের সন্ত্রাস বাস্তব ঘটনা। 'ইসলামি মৌলবাদী' শব্দটি সংসদেও বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম্ সংসদে তা বার বার বলেন। এমনকী অনেক ইসলামি সংগঠনও ইসলামি মৌলবাদের প্রকৃত স্বরূপ জানার জন্যে 'ইসলামি মৌলবাদী' বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। পাটোয়ারি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আগেও অনেকবার ইসলামি মৌলবাদী শব্দ ব্যবহার করেছেন। আজকে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির কারণে তিনি এখন মৌলবাদ-এর আগে 'ইসলামি' শব্দটি প্রত্যাহার করে নিলেন। এর ফলে, ভুল সংকেত পাঠানো হলো এবং এটি একটি

রকিবুল হুসেন

উদাহরণ হয়ে রইল।”

সম্প্রতি অসম বিধানসভায় বনমন্ত্রী রকিবুল হুসেন জানিয়েছেন, ২০০১ থেকে রাজ্যে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ৮৫৭ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে ১,৪১৭ জন সন্ত্রাসবাদী মারা পড়েছে। এখনও উলফা এবং এন ডি এফ বি জঙ্গিরা বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে। ৫৮ জন ইসলামি মৌলবাদী ও আই এস আই এজেন্ট ধরা পড়েছে। একজন আই এস আই এজেন্ট জামিন পয়েছে, অন্য একজন কোনওক্রমে পালিয়ে গিয়েছে। ৫৮ জনের মধ্যে সাতজন আই এস আই এজেন্ট, চারজন হুজি জঙ্গি এবং ৪৭ জন হরকত উল মুজাহিদিন গোষ্ঠীর।

রকিবুল জানিয়েছেন, রাজ্যে আটটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বর্তমানে সক্রিয়। তাদের ক্যাডার সংখ্যা ১,৮৪২ জনের মতো। মুলটা (মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন টাইগার অফ অসম) গোষ্ঠীর ১৪০ জন এবং ৪২ জন মুজাহিদিন ক্যাডার অসমে সক্রিয় রয়েছে।

দেরাদুনই স্থায়ী রাজধানী হতে চলেছে উত্তরাখণ্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দেরাদুনকেই উত্তরাখণ্ডের স্থায়ী রাজধানী হিসাবে ঘোষণার জন্য সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করল দীক্ষিত কমিটি। রাজ্য গঠনের শুরু থেকেই রাজধানী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিস্তর

চিন্তাভাবনা চলেছে। ২০০০ সালে নতুন রাজ্যের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী রাজধানীরূপে দেরাদুনকে ঠিক করা হয়। এরই মধ্যে চলে রাজ্যের রাজধানী নির্বাচন নিয়ে কমিটির বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পর পর ৯ বার কমিটির সময়সীমা বাড়িয়ে চিন্তাচারিতের পর, শেষ পর্যন্ত দেরাদুনকেই স্থায়ী রাজধানী হিসাবে ঘোষণার জন্য সরকারের কাছে রিপোর্ট জমাদেওয়া হয়। রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নিত্যানন্দ স্বামীও রাজধানীর বিষয়ে দ্বিধাচিত্ত ছিলেন। সেই সময় তিনি নিজেও নতুন রাজধানীর বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন। রাজধানী নির্বাচনের বিষয়ে বিচারপতি বীরেন্দ্র দীক্ষিতের নেতৃত্বে তিনি একটি কমিটি গঠন করেন। দীক্ষিত কমিটি দীর্ঘ ৯ বছর পর, সবকিছু বিচার-বিশ্লেষ করে দেরাদুনকেই রাজধানীর জন্য বেছে নিয়েছে। অন্যদিকে উত্তরাখণ্ড ক্রান্তি দল (ইউ কে ডে) শুরু থেকেই এই বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল। তারা শুরু থেকেই নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের দোহাই দিয়ে গারসাঁইকে রাজধানী হিসাবে ঘোষণার দাবী করছিল। কিন্তু কমিটির বিচারে গারসাঁই নয়, রাজধানী হিসাবে দেরাদুনই উপযুক্ত।

রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে এই প্রসঙ্গ টিও ওঠে। তাছাড়া বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়ালও দেরাদুনের বিষয়ে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন। তিনি এই বিষয়ে ক্যাবিনেটে বৈঠকও করেন। অন্যদিকে দীক্ষিত কমিটিও এই বিষয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই কমিটি দিল্লীর পরিকল্পনা নির্মাণ ও স্থাপত্য বিদ্যার স্কুল থেকে নতুন রাজধানীর বিষয়ে একটি সমীক্ষা রিপোর্ট তৈরি করেছে। বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীর পঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করেই এই রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। যাতে রাজধানী হিসাবে দেরাদুনই উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র-র জন্য প্রয়োজন রয়েছে ৫০০ হেক্টর জায়গা।

এছাড়া আরও ১,৫০০ হেক্টর জমিরও দরকার। কমিটির হিসাবেই তা উঠে এসেছে। নতুন দিল্লীর আঙ্গিকেই রাজ্যবাসীকে নতুন রাজধানীর উপহার দিতে চাইছে দীক্ষিত কমিটি।

রাজ্য রাজধানীর বিষয়ে গারসাঁই, হরিদ্বারের আই ডি পি এল কমপ্লেক্স ও, কাশীপুরের নাম উঠে এলেও, রাজ্যের রাজধানী গঠনের ক্ষেত্রে তা মোটেই উপযুক্ত নয়। রেল, সড়ক, পরিবেশ, জল, মাটি, জনবসতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ অন্যান্য বিষয়গুলি বিচার করে দেখা যাচ্ছে, দেরাদুনেরই পাল্লা ভারী। চা বাগানের বড় অংশও রয়েছে দেরাদুনে। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মিলিটারী স্কুল। শুধু তাই নয়, বিমান পরিষেবার দিকেও দেরাদুনই সব থেকে বেশি উপযোগী। রেল, সড়কসহ পরিকাঠামোর উন্নয়ণের দিকেও দেরাদুন অনেকটা এগিয়ে।

অন্যদিকে গারসাঁই-এর ক্ষেত্রে জনসমর্থনও কম। প্রাথমিক পরিকাঠামোরও বড় অভাব রয়েছে এখানে। জলের পাশাপাশি অন্যান্য পরিষেবাও অতটা স্বচ্ছল নয়। রেল ও বিমান পরিষেবা উপযুক্ত নয়। বিশেষ করে দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ অনুন্নত। এছাড়া গারসাঁই-এর মাটির পরিস্থিতিও খারাপ। মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য মোটেই রাজধানী নির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত নয়। ভূমিকম্প ও তুষার বৃষ্টির পরিমাণও গারসাঁই-এ বেশি। আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে গারসাঁই আবার বেশি দূরেও নয়। কাশীপুরের বিষয়ে অনেকে মতামত রাখলেও, সেই স্থানটিও অনুকুল নয় রাজধানী নির্মাণের ক্ষেত্রে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখানেও প্রাথমিক কাঠামোর অভাব রয়েছে। অন্যদিকে হরিদ্বারের আই ডি পি এল কমপ্লেক্স-ও রাজধানী হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না। রেল-সড়ক পরিষেবা মোটেই উপযুক্ত নয়। বিশাল এলাকা হিসাবে গণ্য হলেও কমিটির হিসাবে দেরাদুনই সব দিক থেকে রাজধানীর উপযুক্ত।

ইউ-কে ডে, মহিলা মঞ্চে র মতো কিছু সংগঠন দেরাদুনকে বাদ দিয়ে রাজধানী গঠনের দাবী জানালেও, তা রাজধানী গঠনের ক্ষেত্রে অনুকুল নয়। ফলে কমিটির পাশাপাশি সরকারও চায় দেরাদুনকেই স্থায়ী রাজধানীর মর্যাদা দিতে।

সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মিটতে চলেছে দক্ষিণ ভারতের দুই রাজ্য তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের সাংস্কৃতিক মনোমালিন্য। এই মেটানোর কেন্দ্রে রয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম করুণানিধির তামিল সন্ত কবি থিরুভাল্লুভারের বিশালকায় মূর্তি উন্মোচন করা। গত ৯ আগস্ট ব্যাঙ্গালোরের উলসুর লেকের কাছে করুণানিধি থিরুভাল্লুভারের মূর্তির উন্মোচন করেন। সেই অনুষ্ঠানে এসে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরিয়াপ্পা দিনটিকে 'ঐতিহাসিক দিন' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ করুণানিধির মনে হয়েছে, এই পুরো জিনিসটাই আগামীদিনে অনুকরণীয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

একথা বলাই যায়, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর দুই মুখ্যমন্ত্রীই আপাতত হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। কাবেরী জলবন্টন নিয়ে এক সময় ওই দুই রাজ্যের সম্পর্কের ক্রমেই অবনতি হতে থাকে। বিশেষ করে এই খরার মরসুমে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এছাড়াও এবছর হোগেনাক্কাল জলাধার সমস্যা, সীমান্ত সমস্যা, কন্নড় ভাষাকে তামিলনাড়ুতে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া নিয়ে ক্রমেই উভয় রাজ্যের সম্পর্কই চূড়ান্ত অবনতির দিকে এগিয়ে চলছিল।

আসলে দুই তরফের এই খারাপ সম্পর্ক আজকের ঘটনা নয়। সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করেছিল আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে। তখন কট্টর কন্নড় স্বাদেশিক গোষ্ঠী ব্যাঙ্গালোরে তামিল কবি থিরুভাল্লুভাবের মূর্তি বসাতে প্রবল বাধা দিয়েছিল। এর পাল্টা হিসেবে কট্টর তামিলরাও গত সাত বছর ধরে প্রবল আন্দোলন করে ষোড়শ শতাব্দীর কন্নড় কবি সারভাঙ্গার মূর্তি চেন্নাইতে বসাতে দেয়নি।

যাই হোক, গত মাসে ইয়েদুরিয়াপ্পা চেন্নাই-এর একটি মেডিকেল কলেজে স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য যান। সেখানেই করুণানিধির গোপালাপুরমের বাড়িতে উভয় মুখ্যমন্ত্রী বসে ঠিক করেন, কাবেরী জলবন্টনসহ অন্যান্য

থিরুভাল্লুভার

জ্বলন্ত বিষয়গুলিকে মিটমাট করতে গেলে আগে প্রয়োজন দু'রাজ্যের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রতি উভয় রাজ্যেরই শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

শেষ পর্যন্ত এটাই ঠিক হয় ৯ আগস্ট ব্যাঙ্গালোরে থিরুভাল্লুভারের মূর্তি এবং ১৩ আগস্ট চেন্নাই-এ সারভাঙ্গার মূর্তির উন্মোচন করা হবে। এতে হয়তো কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর সাংস্কৃতিক মনোমালিন্য মিটিতে পারে। কিন্তু ওই দুই রাজ্যের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে তা আগামীদিনে মিটবে কিনা — এই প্রশ্নটাই আজ ঘুরপাক খাচ্ছে।

জম্মু-কাশ্মীরের বাজেট ঃ পণ্ডিতদের জন্য ১৫ হাজার চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কাশ্মীরি পন্ডিতদের লাগাতার আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত টনক নড়ল জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের অবশেষে পুনর্বাসন দিতে রাজি হলো তারা। গত ১০ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের পক্ষ থেকে পণ্ডিতদের জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রে ১৫,০০০ কাজ ঘোষণা করা হয়। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহলের মতে, উচ্ছেদ হওয়া পণ্ডিতদের কাশ্মীরের মাটিতে ফিরিয়ে আনতেই রাজ্য সরকারের এহেন ঘোষণা। এবারের বাজেটে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় পণ্ডিতদের ৫২৪২টি গৃহ নির্মাণের জন্য ১৩০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। প্রথম বাজেট বক্তৃতা পেশ করে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী আব্দুর রহিম রাঠোর বলেন, "আমাদের পণ্ডিত ভাই-বোনদের পুনর্বাসন দেওয়া এবং তাদেরকে কাশ্মীরের সামাজিক পরিমন্ডলে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারটিকে আমাদের জোট সরকার অগ্রাধিকার দেবে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ন্যাশানাল কনফারেন্স-কংগ্রেসের জোটের প্রথমবারের এই বাজেটে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যাপারে শিল্পোন্নয়ণ এবং পর্যটন ও পরিকাঠামো নির্মাণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী রাঠোর এ বিষয়ে বলেছেন, "কর্মসংস্থানের সমস্যা চূড়ান্ত পর্যায়ে (অ্যালারমিং স্টেজ) পৌঁছে গিয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে সর্বাগ্রে দরকার সঠিক নীতি প্রণয়ন করা, নতুন নতুন ক্ষেত্র গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি এই নীতি কার্যকর করার জন্য সঠিক পরিকল্পনা নেওয়া।" কর্মসংস্থানের ব্যাপারটি ঠিকঠিক ভাবে মোকাবিলা করার জন্যে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার শের-ই-কাশ্মীরি কর্মসংস্থান এবং উন্নয়ণ প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকার বাইশটি গ্রামীণ স্বনির্ভর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (রুরাল সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটস বা আর এস ই টি আই এস) গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। প্রত্যেকটি জেলাতে অন্তত একটা করে এই ধরনের প্রকল্প গড়ে তোলা হবে এমনটাই জানা গেছে। ট্যুরিজমের জন্যও বিপুল অর্থ বরাদ্দ করেছে জম্মু-কাশ্মীর সরকার এবং এনিয়ে কিছুনতুন ধরনের পরিকল্পনাও তারা নিয়েছে।

সব মিলিয়ে, উপত্যকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে জম্মু ও কাশ্মীরের অর্থনীতিকে মজবুত করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করতে সরকারের যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকা দরকার। এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনও লক্ষণ কিন্তু দেখা যায়নি ন্যাশানাল কনফারেন্স ও কংগ্রেস জোট পরিচালিত সরকারের। সরকারের এহেন ঘোষণা স্রেফ ভাঁওতাবাজী কিনা তা সময়ই বলবে।

গল্প

দাদা

মানিকচন্দ্র দাস

অবশেষে পরীক্ষায় বসতে রাজি হল নীতা। তখন পরীক্ষার আর মাত্র পনেরো দিন বাকি। রবীনবাবু বারবার বলেছিলেন ব্যারাকপুর গার্লস হাইস্কুলের মান বেশ উঁচু। ভর্তির পরীক্ষা তাই বেশ কঠিন হয়। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেছে; সে সময় একটু না বেরোলে পুজোর ছুটি ছাড়া সময় কোথায়? অতএব সকলে মিলে পনেরো দিন দার্জিলিং কাটিয়ে এল। ফিরে এসে দেখল, রবীনবাবু তাদের সরকারি ফ্ল্যাটে চলে এসেছেন। উদ্দেশ্য — তনুকে ব্যারাকপুরে নিয়ে যাওয়া, আর পরীক্ষার জন্য তৈরী করা। তনু এ বিষয়ে আগ্রহ দেখালেও নীতা বা নীতুর সামান্য ইচ্ছাও নেই। তনুর মুখের দিকে তাকিয়ে শাশ্বত বলল, দাও ওকে ছেড়ে দাও। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যখন .....। নীতুর মুখের দিকে তাকাল শাশ্বত। তখন নীতু বলল, ঠিক আছে বাবা, আপনার যখন এত ইচ্ছা, তখন আপনি ওকে নিয়ে যান। পরীক্ষা হলে আমরা গিয়ে নিয়ে আসব।

সেদিনই রবীনবাবু নাতনিকে নিয়ে এলেন ব্যারাকপুরের ভট্টাচার্য পাড়ায়। যেখানে তাঁর দু'পুরুষের পুরোনো দোতলা বাড়ি। বুড়ো-বুড়ির সংসারে বহুদিনের কাজের লোক উমেশ। পঞ্চাশ পেরেনো এই ভাগলপুরের অধিবাসী বহুদিন ধরে এ বাড়ির বাসিন্দা। রান্না থেকে ডাক্তারখানা যাওয়া পর্যন্ত সকল কাজের সঙ্গে আছে অনেক টুকিটাকি। এই তিনজনের সংসারে যাঁর সবচেয়ে বেশি কষ্ট। তিনি হলেন বাড়ির গিন্নি মহামায়া — রবীনবাবুর সাতচল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনের সবচেয়ে সেবাপরায়ণা সঙ্গিনী। রবীনবাবু একটু আধটু লেখেন, তাই বাইরে তাঁর যোগাযোগ আছে। কিন্তু ভূগোলে সাম্মানিক স্নাতক মহামায়া ক্রমাগত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছেন। খবরের কাগজ ছাড়া আর তিনি বিশেষ কিছু পড়েন না। অর্থাৎ তার পড়ার অভ্যাস নেই। অথচ তিনি গল্প করতে ভালোবাসেন, লোকের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসেন। কিন্তু শহরতলির এই পারিবারিক পরিবেশে দু'একজন নিকট আত্মীয় ছাড়া এই বৃদ্ধার জন্য কেই বা আসবেন সৌজন্য বা কর্তব্যের খাতিরে।

এই অবস্থায় রবীনবাবু তনুকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করলেন।

সেই শুরু। স্কুল মাস্টার ঠাকুরদার সাহচর্যে মাত্র পনেরো দিনের প্রস্তুতিতে মোটামুটি ভালো ছাত্রী, তনু পরীক্ষায় বসল। রেজাল্ট — ওয়েটিং লিস্টে তিন নম্বরে তার নাম। অভিজ্ঞ রবীনবাবু নাতনির ভর্তি সম্বন্ধে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হলেন। এই ফল সকলের খারাপ লাগলেও নীতু মনে মনে খুশি হল, তাহলে তনুর আর ভর্তির কোনও সম্ভাবনা নেই অর্থাৎ কলকাতা ছেড়ে আর আসতে হবে না। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের সাতদিন পরে তনুর ভর্তির ব্যবস্থা করলেন রবীনবাবু। চাকরির জন্য ছ'বছরে বাংলার বাইরে এবং দু-বছর কলকাতায় কাটিয়ে শাশ্বত নীতু-তনু-ঝুনুকে নিয়ে আবার বাল্যের ব্যারাকপুরের জীবনে বয়স্ক বাবা-মার কাছে ফিরে এল।

নীতু পড়ালেও ষষ্ঠ শ্রেণিতে তনুর দু'জন গৃহশিক্ষিকা ছিলেন। ব্যারাকপুরে সে সুযোগ থাকলেও যোগাযোগ করতে সময় লাগছে। রবীনবাবু তনুকে বললেন, আমি তোকে পড়াব, কোনও চিন্তা নেই। নতুন ক্লাসে অনেক বিষয়ই নতুন। এখানে সংস্কৃত পড়তে হবে। গণিতে একটা নতুন শাখা যুক্ত হবে — বীজগণিত। বিজ্ঞান এখন দুটি পত্রের — দু-শ' নম্বর।

নীতুর বেশ চিন্তা বেড়ে গেল। সে সংস্কৃত একটু পারলেও অঙ্কে একেবারে আনাড়ি। অঙ্কের এম এস সি স্বামীর কাছে নীতুর একটা কথা — তুমি মেয়েটার অঙ্কের ব্যাপারটা একটু দেখ সময় করে। এ বছর বীজগণিত একেবারে নতুন, আবার জ্যামিতিটাও বেশ কঠিন।

উদ্বিগ্ন নীতুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে শাশ্বত বলল, তুমি তনুর ব্যাপারে কিছু চিন্তা কর না; সবটা বাবার ওপর ছেড়ে দাও।

— তুমি কী বলছ, আমি বুঝতে পারছি না। বাবা তো সাহিত্যের লোক। উনি ....

— আরে তিনি কলেজেও দু বছর অঙ্ক পড়েছেন। আমার ও চিরন্তনের অঙ্কের ভিত তো বাবার হাতে। দুটো বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তবে তুমি যা বলার আমাকে বলবে। তনু বা বাবার সামনে পড়াশুনা নিয়ে সামান্য উদ্বেগ দেখিও না বা পড়াশুনার কোনও কথা বল না।

সংক্ষিপ্ত এই সংলাপের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর আলোচনা সেদিন শেষ হল। নীতুও শাশ্বতের কথা রাখল। হাফ্-ইয়ারলির আগে পর্যন্ত বাড়িতে কোনও কথা বলল না।

বাড়িতে আসার পর তনুর লাইফ-স্টাইল বদলে দিয়েছেন রবীনবাবু। এরকম স্টাইলেই তিনি ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন, শাশ্বত-চিরন্তনকে চালিয়েছেন এবং একটা সুন্দর পারিবারিক আবহাওয়া গড়ে তুলেছিলেন। মহামায়া তো ভোলেন নি। তবে আজকাল বৌমা আসার পর মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে সাড়ে এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত টিভির সামনে বসে থাকেন। তারপর ঘুমুতে যান।

সাড়ে দশটার মধ্যে ঘুমুতে যান রবীনবাবু এবং সকালে ওঠেন পাঁচটায়। শীত-গ্রীষ্মে একটু এদিক-ওদিক হলেও মোটামুটি বাঁধা ছক। একতলার আলাদা-আলাদা ঘরে থাকেন রবীনবাবু ও মহামায়া। দোতলার বড়ো ঘরে শোয় ঝুনুকে নিয়ে শাশ্বত ও নীতু। পাশের ঘরে এবার তনুর একার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তাই কারোর কোনও অসুবিধা হয় না। রাতে শাশ্বতের একটু বই পড়ার অভ্যাস আছে। অবশ্য যতই পড়ুক, এগারোটার মধ্যে শুয়ে পড়ে। নীতুর এই টিভি দেখার অভ্যাসের জন্য অনেক অশান্তি হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। এখন অবশ্য কারোর বিশেষ অসুবিধা হয় না। মেয়েদের পড়াশুনা চলে রবীনবাবুর রুটিনে।

কাজের ঠিকে মেয়েটি সাড়ে পাঁচটার মধ্যে চলে আসে। উঠোন ও একতলার প্রায় সবটা ঝাঁট দিয়ে সব্জি কাটতে বসে। ছ'টার মধ্যে পুজো সেরে উমেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ে রান্নার জন্য। নীতুকে দেখা যায় সাতটার কাছাকাছি। ঐ সময়ের কাছাকাছি ওঠেন মহামায়া। শাশ্বতের ট্রেন ন'টায়। দশটার কাছাকাছি খান রবীনবাবু আর তনু। শাশ্বত-তনু-রবীনবাবুর খাওয়া ও অন্য তদারকি করে নীতু।

অবসর জীবনে অনেক কিছু বদলে গেলেও রবীনবাবুর দশটায় ভাত খাওয়ার অভ্যাসটা বদলায়নি। দুপুরবেলায় কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকলেও তিনি দুপুরে ঘুমোন না। বরং ঐ সময় তিনি প্রায় নিস্তব্ধ বাড়িতে লেখার মেজাজ পান। আড়াইটা থেকে তিনটের মধ্যে তিনি কিছু ফল খান। সেই সঙ্গে সামান্য কিছু মুড়ি, ভাজা চিড়ে বা বাদাম বা কোনোদিন ছানা। সন্ধ্যায় এক কাপ চায়ের সঙ্গে দু'পিস ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট। রাতে খান দুপিস রুটি, সঙ্গে কিছু তরকারি বা ডাল। দুপুরে মাছ খেলেও সকলের জন্য তা রান্না হয় বেশ হাল্কাভাবে — বেশি তেল, নুন বা মশলা নয়। নটার মধ্যে তিনি খেয়ে নেন। প্রায় সবদিন রাতে নাতনিদের পড়া নিয়ে কাটালেও মাঝে মাঝে টিভিতে দু'একটা অনুষ্ঠান দেখেন বা রেডিও শোনেন। টিভির চেয়ে তাঁর রেডিও বেশি পছন্দ। তাঁর এই অদ্ভুত পছন্দ নিয়ে তনু থেকে মহামায়া পর্যন্ত বেশ গল্পের রসদ পান।

পাঁচটায় উঠে নাতনিকে নিয়ে নিরিবিলি পথে বেড়াতে যান বা পার্কে একটু ছোটাছুটি করেন রবীনবাবু। এই সময়টা তনুর খুব ভালো লাগে। এই সময় দাদাকে যেন একেবারে কাছে পায়। দাদু যেন তার বয়সী একটা ছেলে, তাঁকে বন্ধুর মতো সব কথা বলা যায়। অল্প দু'একজন লোক তখন পথে বেরিয়েছে। চারদিক বেশ শান্ত। পাখির ডাক আর গাছপালার মৃদু দোলা তনুর মনকে যেন দুলিয়ে দেয়।

দাদা বলেন, এই সময় প্রকৃতি ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। গাছ-পালার সঙ্গে পাখিরাই জাগে সবার আগে। সূর্য উঠি-উঠি করছে। সে যেন সকলকে আহ্বান করছে — জাগো ওঠো কাজে লেগে যাও। পৃথিবীর যতকিছু বিরাট সৃষ্টি বেদ-বেদান্ত উপনিষদ সবই এই সময়েরই রচনা। 'জবা কুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং' .... সূর্যপ্রণাম তুই তো জানিস। যখন মুনি-ঋষিরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, তখন তাঁরা নদীতে ডুব মেরে নবোদিত সূর্যকে প্রণাম করে চান শেষ করছেন। মনে মনে সেই সূর্যের স্তব করতে করতে ধীরে ধীরে আশ্রমে ফিরে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ সেখানে ধ্যান, তারপর শুরু করছেন দিনের কাজ। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-রচনা। আর আমরা? আমরা এই প্রকৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমরা এই মূল্যবান সময়টা ঘুমিয়ে বিছানা ছাড়ছি সাড়ে ছটা, সাতটা বা আটটায়। শাস্ত্রের কথা বাদই দিলাম। প্রকৃতি কিন্তু তা চায় না। তাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয়। তাই আমাদের দরকার এই মূল্যবান সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করা। তুই নিজে পরীক্ষা করে দেখতে পারিস। যা তোর বেশ কঠিন লাগে বা ভালো বুঝতে পারিস না, তা এই মাহেন্দ্র-মুহূর্তে চর্চা করলে নিশ্চয়ই সহজ হয়ে যাবে, কারণ প্রকৃতি তোকে তখন সাহায্য করবে।

মর্নিং ওয়াকের শেষে ফেরার সময় দাদা এ ধরনের অনেক কথা বলেন। এই কথাগুলোর সঙ্গে প্রকৃতির এই পরিবেশ যেন বেশ মানিয়ে যায়। তনুর চোখের সামনে সব ভেসে ওঠে অতীতে গুরুগৃহের সেই জীবনযাত্রা। সে যেন দেখতে পায় গাছের তলায় ছাত্ররা সারিবদ্ধ ভাবে বসে পড়াশুনা করছে। কাছেই আচার্য গাছের পাতায় কিছু লিখছেন বা ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছেন। বড়দের পাঠের সঙ্গে দৈনন্দিন কিছু কাজের দায়িত্ব দিচ্ছেন।

হাফ-ইয়ারলির খাতা বেরোতে শুরু করেছে। এই স্কুলের রেওয়াজ — তিনদিনের জন্য খাতা বাড়িতে দেখতে দেওয়া হয়। তিনদিন পরে অভিভাবকের সই-সহ খাতা ফেরত দিতে হয়। বাংলায় তৃতীয়, ইংরেজিতে দ্বিতীয় হয়েছে তনু; কিন্তু অঙ্কে মাত্র ৭৫, যেখানে সর্বোচ্চ নম্বর ৯০। খাতাটা নিয়ে ভালো করে দেখে রবীনবাবু হেসে বললেন, একেবারে পাগলি; সামান্য এই ভুল দুটো কী করে করলি বুঝতে পারলুম না। তোর ৮৫ নম্বর পাকা অথচ ...। যাক্, এ নিয়ে মন খারাপ করিসনে। পরীক্ষার হল একটা ম্যাজিক প্লেস — কোথা থেকে কী হয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। তাই চেষ্টা করতে হবে, ভবিষ্যতে যাতে এই ম্যাজিক প্লেসকে স্বাভাবিক করা যায়। তারপর আবার হেসে বললেন, ৩ (ক) প্রশ্নটা তুই পারবি না আমি জানি; কিন্তু তুই চেষ্টা করেছিস দেখে ভালো লাগল। জানি না তোদের ক্লাসের কেউ পেরেছে কিনা।

তনু বলল, একটা মেয়ে পেরেছে সে কিন্তু মাত্র ৬৫ নম্বর পেয়েছে।

— বা, মেয়েটি সত্যি ভালো — অঙ্কে মাথা আছে। যাক্, এ নিয়ে তুই চিন্তা করিস নে। নম্বর পাওয়া বড় কথা নয়, ভালো করে বোঝাটা বড় কথা। যে ভালো বোঝে, সে একদিন ভালো করবেই।

ওঁদের কাছে আসতে আসতে বোধ হয় শেষের কথাগুলো শুনেছিল নীতু। বলল, বাবা, এ কী বলছেন! ও তো অঙ্ক বোঝেই না, নম্বর পাবে কী করে? ওদের ক্লাসে অন্তত আধ ডজন মেয়ে আছে যারা ৭৫ থেকে ৯০-এর মধ্যে পেয়েছে। তাহলে ওর কৃতিত্ব কোথায়? একটু থেমে তনুর দিকে তাকিয়ে আবার বলল, আমি আপনার ছেলেকে প্রায়ই বলি মেয়েটার অঙ্কটা তুমি নিজে একটু দেখ; কিন্তু .... তার কথা শেষ করতে না দিয়ে তার মুখের দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে রবীনবাবু বললেন, তুমি অনেকটা ঠিক বলেছ বৌমা। বাবা-মা দেখলে ছেলে-মেয়ে ভালো হয়। তবে অঙ্কের ব্যাপারটা তুমি ভালো বুঝবে না বলে, তোমাকে কিছু বলতে পারছি না। তবে ওর বাবা, অঙ্কে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া আমার বড় ছেলে, জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় মাত্র ৩৪ নম্বর পেয়েছিল। তাই .... কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন রবীনবাবু। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, তুমি এই খাতাটা নিয়ে খোকাকে দেখাও। সে বলে দেবে, অঙ্কে তনু ঠিক কেমন করেছে এবং এও বলে দেবে অ্যানুয়াল পরীক্ষায় সে কেমন করবে।

শ্বশুরমশায়ের এই ধরনের কথা শুনতে কিছুটা অভ্যস্ত নীতু। তিনি স্পষ্ট করে জোর দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন। কারোর সঙ্গে মত পার্থক্য হলে নিজের মত চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন না। বাপের আদরের বড়ো মেয়ে নীতু, কলকাতার বাইরের কোনও স্থায়ী ঘরের কথা ভাবতে পারে না। তাই প্রকাশ্যে না বললেও তার অনিচ্ছায় এখানে স্থান বদলের জন্য সে বৃদ্ধের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। অন্য ব্যাপার হলে সে জোর তর্ক করত, যা প্রায় ঝগড়ার কাছাকাছি। কিন্তু এখানে খাতাটার ব্যাপারে স্বামী জড়িত, তাই আর কিছু কথা না বলে খাতাটা নিয়ে ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে গেল।

ব্যাপারটা কী হল তা আর জানা গেল না। তবে অঙ্ক নিয়ে কেউ, বিশেষ করে নীতু আর কিছু বলল না। পরদিন সকালে নীতু দেখল তনু তার বাবার কাছ থেকে খাতা নিয়ে বেরিয়ে আসছে। বেশ হাসিখুশী। তখন নীতুর একটু খারাপ লাগল। বাবা আর ঠাকুরদা মিলে মেয়েটাকে যেরকম আস্কারা দিচ্ছে — মেয়েটার লেখাপড়া কেমন হবে কে জানে!

দুদিন পরে বেরোল সব খাতা। সবগুলোর নম্বর আশানুরূপ। কিন্তু ভূগোলে ৬১ আর ইতিহাসে ৫৫। এবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল নীতু। মেয়েকে বলল, দিনরাত কেবল বেড়ানো আর গল্প, সেই সঙ্গে গল্পের বই পড়া। পড়ার বইগুলো ভালো করে না পড়লে এরকমই ফল হবে। কলকাতার একটা সাধারণ স্কুলে তুই ফার্স্ট হতিস বলে ভেবেছিস এখানে এই ভাবে পড়াশুনা করলে এই নামী স্কুলে সেরকম ফল হবে। যা ভাবগতিক দেখছি। তুই দশের মধ্যেও থাকতে পারবি না। শেষের দিকে তার কথাগুলোয় ছিল বেশ

জোর।

সে সময় শাশ্বত বাড়িতে ঢুকছিল। সে বোধ হয় নীতুর কথাগুলো ভালো করে শুনেছিল। ঘরে ঢুকে মা-মেয়ের সামনে দাঁড়াল; বলল, ঠিক বলছে নীতু, খেলাধুলা আর গল্পের বই পড়া একেবারে বন্ধ করে দাও। পড়ার বই যে ভালো করে পড়ে না, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তা একটা কাজ কর — তুমি তো ইতিহাসের লোক। বাজারে দেখ দেখি ইতিহাসের কোনও ট্যাবলেট পাওয়া যায় কিনা। দু-চারটে কিনে দাও। এখন দেখছি, ঐ বুড়ো মাস্টারকে দিয়েও হবে না। কারোর দিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

টেবিলের উপর খাতায় কী লিখছিল বা আঁকছিল তনু। সে একবার বাবার মুখের দিকে তাকাল। নীতুও তাকাল কর্তা ও তনুর মুখের দিকে। বাবার কথায় তনুর মুখে কিছু প্রতিক্রিয়া হয়েছে মনে হল না। বরং... । কর্তার কথা বলার ভঙ্গিতে নীতু বুঝবার চেষ্টা করল — শাশ্বত কি সত্যি অসন্তুষ্ট হয়েছে মেয়ের উপর, না নীতুর বাড়াবাড়ি দেখে বিদ্রূপ করে গেল। এ ধরনের কিছু কিছু কথা বলে শাশ্বত, যা সে সরাসরি বুঝতে পারে না। তবে অফিস থেকে সবে এসেছে, তাকে আর এ মুহূর্তে কিছু বলতে চায় না সে।

সাতদিন পরে ফল বেরোল। তনু চতুর্থ হয়েছে। প্রথমের সঙ্গে তার ব্যবধান মাত্র ২৫ নম্বর, যার মধ্যে কেবল অঙ্কের ব্যবধান ১৫ নম্বর। ইতিহাসে লিখিত অংশে সর্বোচ্চ ৬১ আর, ভূগোলে ৬৭। দুটো নম্বর অন্য দুটি মেয়ে পেয়েছে, যারা প্রথম দশজনের মধ্যে নেই।

সে বছরে নতুন দুটি ছাত্রীর মধ্যে শ্রাবণী সামন্তের এই ফলাফলে দিদিমণিরা বেশ আনন্দিত। ক্লাসের ভালো মেয়েরা তার দিকে ঈর্ষার সঙ্গে তাকালেও শেষ পর্যন্ত তার ভদ্র ব্যবহার ও স্বচ্ছন্দ মেলামেশায় তারা বেশ সহজ হয়ে গেল।

সেভেন-এর বার্ষিক পরীক্ষায় তনু মাত্র পাঁচ নম্বরের জন্য দ্বিতীয় হল। অষ্টম শ্রেণীতে নম্বর ভালো পেলেও অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় সে তৃতীয় স্থান পেল।

পুজোর কয়েকদিন পরে রবীনবাবু তনুকে বললেন, বিসর্জনের বাজনা বাজছে, আর বেশিদিন নয় দিদিভাই। অনেকক্ষণ রবীনবাবুর শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তনু বলল, তুমি চুপ কর তো দাদা। তোমার কী হয়েছে যে এখনি চলে যেতে হবে।

— হয়তো আমার বয়সী অন্য লোকের চেয়ে আমি সুস্থ। কিন্তু ভাই, ডাক যখন আসে, তখন চলে যেতেই হয়। বড় জোর তোর বার্ষিক পরীক্ষা পর্যন্ত। আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। এমন সময় কী একটা কাজে নীতু সেখানে এল, আর মেয়েকে নিয়ে চলে গেল।

তনু এরপর অনেক প্রশ্ন করেছে দাদাকে; কিন্তু আর কোনও সাড়া পায়নি। দাদা তাকে পড়াশুনার বাইরে অনেক কথা বলতেন; বিশেষ করে তাঁর নিজের ভ্রমণ বা অদ্ভুত অদ্ভুত বই-এর কথা। পড়াশুনা সম্পর্কে মাঝে মাঝে বলতেন, যে ভালো বোঝে, সে ভালো প্রকাশ্য করতে পারে। তাই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখার দিকে জোর দিতে হবে। সত্যিকারের মনযোগ এলে অল্প সময়ে অনেক কিছু আয়ত্ত করা যায়।

মার্চের শেষে বার্ষিক পরীক্ষা। শেষ দুদিন ভূগোল আর ইতিহাসের পরীক্ষা। ভূগোল পরীক্ষার আগের দিন ব্যারাকপুরে জোড়া খুন। আর তাই দুদিন ব্যারাকপুর বন্ধ। রবিবার নিয়ে এরপর তিনদিন ছুটি স্থানীয় কোনও পার্বণের জন্য। চারদিকে উত্তেজনা থাকলেও তনু বেশ ভালো মনেই পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু রবিবার সকালেই হার্ট অ্যাটাকে রবীনবাবু চলে গেলেন। তনু মোটামুটি জানলেও শাশ্বত ও নীতু এ রোগের খবর রাখত। ব্যবস্থাও যথেষ্ট ভালো ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করা গেল না। স্থানীয় ডাক্তার আসার পাঁচ মিনিট আগে রবীনবাবু এ পৃথিবীর শেষ বাতাসটুকু ত্যাগ করলেন। আকস্মিক এই বিপর্যয় সামন্ত পরিবার একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। মুম্বাই নিবাসী ছোটো ছেলে চিরন্তন বিকেলে এলে

যথাযথ অন্ত্যেষ্টি হল।

সবচেয়ে অসহায় লাগল তনুকে। তাকে পরীক্ষায় বসানো একেবারে কঠিন হয়ে পড়ল। অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরীক্ষায় বসানো হল। যাই হোক, বার্ষিক পরীক্ষায় সে নবম স্থান পেল ইতিহাস ও ভূগোলে শতকরা পঞ্চাশের নীচে নম্বর পেয়ে।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস, ক্লাস নাইন। নতুন ক্লাসের প্রায় দু'মাস কেটে গেল; কিন্তু তনু তখনো স্বাভাবিক হতে পারেনি ঠাকুরদার শূন্যতায়। তার জীবনে দাদা কেমন ছিলেন, সে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে। অন্যদিকে বিজ্ঞান ও অঙ্কের ভালো গৃহশিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আপাতত শাশ্বতই দেখছে তিনদিন — বুধবার, শনিবার ও রবিবার। অবশ্য উচ্চপদস্থ অফিসার বলে অনেক সময় তনুকে ঠিকমতো দেখতে পারে না সময় ধরে।

ইংরেজি ও বাংলা পড়ান শিবুবাবু অর্থাৎ শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী — শাশ্বতর শিক্ষক ও রবীনবাবুর সহকর্মী। রবীনবাবু কথা প্রসঙ্গে একদিন শাশ্বতকে বলেছিলেন, ইংরেজি-বাংলার অসুবিধা হলে শিবুকে বলিস। শিক্ষক হিসেবে শিবুবাবু বেশ কৃতী এবং ছাত্র মহলে বেশ জনপ্রিয়। তবে একটু খ্যাপাটে গোছের।

ধীরে ধীরে ধাতস্থ হবার চেষ্টা করছে তনু। মাঝে মাঝে কোনও প্রসঙ্গে বা অলস নির্জন মুহূর্তে দাদার কথা মনে পড়ে। দাদার পড়ানোর সঙ্গে শিবুবাবুর মিল আছে। তিনিও বেশ উৎসাহের সঙ্গে নতুন ছাত্রীকে পড়ান। কিন্তু ঠিক দাদার মতো যেন নয়। কোথাও যেন একটু ঘাটতি আছে। নীতুরও শিবুবাবুকে বেশ পছন্দ।

সেদিন শিবুবাবু চলে যাবার সময় বললেন, দেখ বৌমা, শনিবার সাড়ে চারটেয় টিভিতে রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' দেখানো হবে। আমি এখানে তনুকে নিয়ে অতিথি দেখব। অবশ্য নীতু বা মহামায়ার অসুবিধে হবার কথা নয়। দিবানিদ্রা সেরে নীতু গল্পের বই পড়ার চেষ্টা করে। মহামায়া বরং কাজের ফাঁকে ওদের সঙ্গে টিভি দেখতে বসে মাঝে মাঝে। মাসে অন্তত: দুদিন এরকম হয়। নীতু চায় না এভাবে তনুর পড়াশুনার ক্ষতি হয়। অবশ্য তনুর এ অভ্যাসটা একেবারে নতুন নয়। দাদা এ সময় টিভি না দেখলেও, তনুকে অনেক সময় বলতেন — ওদিন ওই বইটা আছে সাড়ে তিনটেয়। দেখে আমাকে গল্প বলিস। তা নিয়ে চলত অবশ্য অনেক লম্বা আলোচনা দুজনের মধ্যে।

হাফ ইয়ারলির পরীক্ষার ফল বেরোল। দিদিমনিদেরও তার কিছু বন্ধুদের ধারণা ছিল — তনু প্রথম যদি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় হবে। কিন্তু দেখা গেল সে চতুর্থ স্থান পেয়েছে। নতুন দুটো মেয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়ে অনেকের হিসেব গরমিল করে দিয়েছে। এবারেও সে ইতিহাসে ও ভূগোলে আশানুরূপ নম্বর পায়নি। নাইন-এ ইতিহাস ভূগোলের শিক্ষক চেয়েছিলেন নীতু। কিছুতেই রাজি হয়নি তনু — ভালো করে পড়লে আমি ভালোই করব ঐ বিষয়ে। দাদা থাকলে .... ঝাঁজিয়ে উঠল নীতু। কথায় কথায় দাদা। তবু যদি একটু নজরে পড়ার মতো নম্বর পেতিস। দাদাকে নিয়ে আর আদিখ্যেতা ..... মেয়ের দিকে তাকিয়ে নীতু চুপ করে গেল। হঠাৎ যেন বিষাদে ঢেকে গেল তনুর মুখ। সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নীতু স্পষ্টভাবে বুঝল, বাড়ির জীবন্ত সব মানুষের চেয়ে তনুর কাছে মৃত দাদা এখনো অনেক প্রাণবন্ত, অনেক শক্তিশালী।

পঞ্চ ম স্থান পেয়ে দশম শ্রেণিতে উঠল তনু। ইতিমধ্যে অবশ্য অঙ্ক-বিজ্ঞানের জন্য এসেছেন যোগেনবাবু — পাশের স্কুলের নতুন শিক্ষক যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তিনিও অল্পদিনের জন্য হলেও শিক্ষক হিসেবে রবীনবাবুকে পেয়েছিলেন। প্রিটেস্ট পরীক্ষায় তনু হল তৃতীয়। দেখতে দেখতে এসে গেল মাধ্যমিক টেস্ট। মাত্র পাঁচ নম্বরের জন্য সে প্রথম হতে পারল না। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় মেয়ে দুটির অগ্রগতি দেখে শিক্ষিকাদের খুব ভালো লাগল। দুজনে গড়ে শতকরা ৮৫-র উপরে নম্বর পেয়েছে। এই স্কুলের পড়াশুনার মান এমনিতেই ভালো; তার ওপর টেস্ট-এর খাতা দেখা হয় কড়া করে অর্থাৎ সেখানে এ ধরনের নম্বর পাওয়া একটা ভালো সংকেত।

২৭ জুন মাধ্যমিকের ফল বেরোবার কথা। ২৬ জুন বিকেলে তাদের বাড়িতে এলেন কয়েকজন সাংবাদিক। তখন শাশ্বত অফিসের কাজে দিল্লীতে। কিছুক্ষণ আগে নীতু বাইরে গেছে, ফিরতে খানিকটা রাত হবে। মহামায়াকে নিয়ে তনু খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে কথা বলল।

শ্রাবণী সামন্ত সাতটা লেটার মার্কস পেয়ে শতকরা ৯৭ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় নবম স্থান পেয়েছে এবং মেয়েদের মধ্যে হয়েছে প্রথম। ঐ স্কুলের অন্য একটি মেয়ে শতকরা ৯৫ নম্বর পেয়ে ভালো ফল করেছে। দশের মধ্যে না থাকলেও হয়তো কুড়ির মধ্যে থাকবে। শ্রাবণীর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রেরণা তার দাদা — ঠাকুরদা রবীন সামন্ত। সাংবাদিকদের কথায় ছবি তোলার সময় টেবিলের উপর দাদার ছোটো ফটো-শুদ্ধ সে ছবি তুলল। বাবা-মা ছাড়া তার গৃহশিক্ষক দু'জন শিবুবাবু ও যোগেনবাবু। তার হবি ভ্রমণ, সেই সঙ্গে গল্পের বই বা ভ্রমণকাহিনী পড়া। তার ইচ্ছা, ভবিষ্যতে সে ডাক্তার হবে।

প্রায় সাড়ে আটটার কাছাকাছি ফিরল নীতু। মহামায়ার সঙ্গে তার দেখা হলেও তিনি তাকে কিছু বললেন না কেবল তনুর কথা রাখতে। সকালে পৌনে সাতটায় ছোটো বোন মিতুর ফোন পেয়ে খুব রেগে গেল নীতু। মিতু ফোন তুলে বেশ রাগের সঙ্গে বলল, তোর বাড়িতে এতো বড়ো কাণ্ড ঘটে গেল; আর আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। আমাদের এত পর ভাবিস। খবরের কাগজ দেখে আমাদের জানতে হল? আগে তো বলেছিলাম, কলকাতার কোনও একটা ভালো স্কুলে ওকে ভর্তি করে দে। তাহলে ... বলেই ফোনটা রেখে দিল।

দারুণ উত্তেজনায় নীতু নীচে নেমে এল। ততক্ষণে খবরের কাগজ এসে গেছে — একটা ইংরেজি ও একটা বাংলা। বাংলা কাগজেই বেরিয়েছে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশজনের বিস্তৃত বিবরণ — সঙ্গে ছবি। মেয়ের ছবি দেখে অবাক হয়ে গেল নীতু। অতি সাধারণ একটা শাড়ি ও ব্লাউজ পরা। নিজের ছবি তোলার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী যেন ঠাকুরদার ছবি তোলার জন্য।

ব্যাপারটা অত্যন্ত খারাপ লাগল নীতুর। শাশুড়িকে এক হাত নেবার জন্য তাঁকে খুঁজতে গেল। তিনি ঘরে নেই। শাশুড়ির পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে নীতু অবাক হয়ে গেল এ ঘরটা রবীনবাবুর। রবীনবাবুর মৃত্যুর পর এ ঘরে কেউ শোয় না। তবে এখানে তনু মাঝে মাঝে পড়াশুনা করে। সেই ঘরটা গুছিয়ে পরিষ্কার করে রাখে। এত সকালে তনু চান করে মহামায়ার একটা কাচানো সাদা জমির লালপাড় শাড়ি পরেছে। দাদার টেবিল থেকে দু'একটা বই ছাড়া সব সরিয়ে দিয়েছে। তার মাঝখানে ছবি রেখে দুপাশে বাড়ির ফুল দিয়ে ফুলদানি সাজিয়েছে। ধূপদানিতে ধূপ জ্বলছে। তনু একদৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকিয়ে আছে।

নীতুর ভালো লাগলেও তখনো তার মন শান্ত হয়নি। কেন মহামায়া বা তনু তাকে জানায়নি। তার মনে উষ্মা জমেছিল। তাই সে কীভাবে শুরু করবে ভেবে পেল না। হঠাৎ সে বলল, তোর মাসি বলছিল, কলকাতার ভালো স্কুলে পড়লে তুই তিনজনের মধ্যে হতে পারতিস। দাদার কথায় এই পাড়াগাঁয়ের স্কুলে ভর্তি হলে বলে ....

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে তনু তার মায়ের দিকে ঘুরল। তার দুটি চোখ জলে ভরা। সে বলল, লোকটা দু-বছর আগে মরে গেলেও তোমার হাত থেকে নিস্তার পেল না। তাই কথায় কথায় শুধু তাঁরই কথা তোল। এমন দিনেও তাঁকে তুমি ভালোভাবে নিতে পারলে না। শোন মা, তোমাকে একটা কথা স্পষ্ট করে বলি — আর একবার শুধু একবার যদি তুমি দাদার কথা তোল, তাহলে তোমাদের এ বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতো আমি চলে যাব।

মেয়ের জলভরা অথচ কঠোর চোখের দিকে তাকিয়ে নীতু বিস্ময়ে ভয়ে মাথা নিচু করে চলে গেল। নিঃশব্দে কখন তনুর পাশে দাঁড়িয়েছেন মহামায়া খেয়াল করেনি সে। ধীরে ধীরে তনুর মাথায় হাত রাখলেন মহামায়া।

মহামায়াকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তনু।

সীমাহীন দ্বিচারিতা

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের পর এখন লালগড় খবরের শিরোনামে। নভেম্বর ২০০৮-এ মুখ্যমন্ত্রীর উপর আক্রমণের প্রচেষ্টা থেকে শালবনী এবং লালগড়ের সাধারণ মানুষদের দুর্দশার শুরু। তারপর থেকে তাদের উপর চলছে অকথ্য অত্যাচার এবং সাধারণ নিরন্ন গ্রামবাসীদের মাওবাদী তক্‌মা দিয়ে জেলে পোরার খেলা।

দ্বিচারিতার প্রশ্নে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর জবাব নেই। পশ্চি ম মেদিনীপুরসহ বিভিন্ন গ্রামাঞ্চ লে সাধারণ মানুষের সমর্থন চলে যেতেই, তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। আবার লালপার্টির জঙ্গল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রের হাতে পায়ে ধরে কেন্দ্রীয় বাহিনী এনে মাওবাদী নিধন নাটকে নামলেন। মনে পড়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি পশ্চি ম মেদিনীপুরের মানুষজনকে নানান আশার বাণী শুনিয়েছিলেন। ছিল অঢেল কর্মসংস্থানের ফাঁকা প্রতিশ্রুতি। লোকসভা পর্ব মিটে যেতেই আবার যেই সেই। দীর্ঘ বাম জমানার এই ধাপ্পাবাজি সাধারণ মানুষ আজ ধরে ফেলেছে। তাই কী লোকসভা কী পৌরসভা সব জায়গাতেই তারা আজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বাস্তব চিত্র হল, মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলের জন্য এই সরকার দীর্ঘ ৩২ বছরে কোনও কাজই করেনি। তাই এখানকার সাধারণ মানুষ হয়েছে আরও দরিদ্র। ভৌগোলিক কারণে বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষাবাদ প্রায় হয় না বললেই চলে। তাদের একমাত্র আয়ের উৎস জঙ্গলের কেন্দু পাতা যা বিড়ি বাঁধার কাজে লাগে। সেখানেও এই অপদার্থ সরকার নানান আইনের প্যাঁচে ফেলে তাদের ভাতে মেরেছে। এই দারিদ্র্যের সুযোগে সেখানে হয়েছে, মাওবাদীদের বাড়-বাড়ন্ত। আসলে জঙ্গলমহলের এই অপারেশনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সেজের নামে লক্ষ লক্ষ একর জমি নিয়ে সেটা শিল্পপতি প্রমোটারদের জলের দরে বেচে দেওয়া। নামাবলী গায়ে দিয়ে, কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া শত শত কোটি টাকা, ইন্দিরা আবাস যোজনার টাকা, নিজেদের পকেটে পুরেছে। হয়তো হয়েছে ঝাঁ চকচকে পার্টির অফিস, সেইসব জায়গায় জন্ম নিয়েছে অনুজ পান্ডের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাগণ। তাই আজ সাধারণ মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে হত্যালীলায় মেতেছে। যে কোনও হত্যাই দুঃখজনক, কিন্তু পাপ কাউকে ছেড়ে কথা বলে না, সেটাও সমানভাবে সত্যি।

পরিশেষে বলা যায় যে, নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে তারা মাওবাদী সম্পর্কে তাদের দায়িত্ব এড়াতে চাইছে। কিন্তু মাওবাদীরা যে বিক্ষুব্ধ বামপন্থী তা আজ দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। বামপন্থীরা তিনটি ভাগে বিভক্ত : মার্কসবাদী, লেনিনবাদী আর মাওবাদী, যারা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী। তাই মাওবাদীরা যে বামপন্থীদেরই জারজ সন্তান তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুশান্ত কুমার দে, কলকাতা - ১০৩

চিঠিপত্র

কলকাতা পুরসভা

কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র বিকাশবাবুর 'কলকাতা পুরসভার নোবেল পাওয়া উচিৎ' এই হাস্যকর মন্তব্যে বাংলাদেশের একটা প্রবাদের কথা মনে পড়ে গেল — কর্তাবাবু এমনডা কইয়েন না ঘুড়ায় হাসব"।

প্রথমত কলকাতা পুরসভাকে কে নোবেল দেবে মুখ্যমন্ত্রী না বিমান বসু? মেয়র মহাশয়ের কথা শুনে মনে হচ্ছে উনি নোবেল কমিটির বহু সদস্যের একজন। কলকাতার পুরসভাকে যদি শুধু নোবেল দেওয়ার ব্যাপারে নামও পাঠানো হয়, তাহলে মনে হয় ভূতপূর্ব নোবেল প্রাপকগণ — তাদের পুরস্কার ফেরৎ দিতেন। নোবেল দেওয়া হয় ফেমাসদের। এবার থেকে কলকাতার পুরসভার নটোরিয়াসদেরও নোবেল দেওয়ার জন্য পশ্চি মবঙ্গের শাসকশ্রেণী থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে নটোরিয়াস নোবেল কমিটি গঠন করা উচিৎ।

পরিশেষে জানাই, কলকাতা পুরসভাকে নোবেল দেওয়া উচিৎ, নাহলে যে সত্যের অপলাপ হবে। তাহলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের পর কলকাতা পুরসভার বর্তমানের সকলকে যা দেওয়া হবে তার উচ্চারণ হবে নোবেল, কিন্তু বানান হবে **NO BAIL**, বর্তমানের পুরসভার জামিন অযোগ্য জেলই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর কোনও কারণে বহু দুঃখে বলেছিলেন, "এ মণিহার আমায় নাহি সাজে"। এবার তাঁর আত্মা হয়তো বলবেন, তাইতো বসে আছি, এ হার তোমায় (বিকাশবাবুকে) পরাই যদি তবেই আমি বাঁচি।"

দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

মুসলিম আগ্রাসন

তেত্রিশ বছরের বামশাসিত পশ্চি মবঙ্গে এক শ্রেণীর উগ্র ইসলামপন্থী, ভারত বিরোধী, পাকিস্তানপন্থী, হিন্দু বিদ্বেষী এবং তালিবান-আল কায়েদা-আই এস আই মদতপুষ্ট মুসলিম এ রাজ্যকে ইসলামিক রাজ্যে পরিণত করতে হয়েছে তৎপর। এরা এই রাজ্যেরই বাসিন্দা, বাংলা ভাষাভাষী এবং সেকুলারবাদী দলগুলির সমর্থক ও তাদের ছত্রছায়ায় আশ্রিত — যাদের দেশীয় সন্ত্রাসবাদী বললে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে — ওই শ্রেণীর মুসলিমরা এই রাজ্যে ইসলামিক আধিপত্য বিস্তারে কতটা সক্রিয়। এখানে ঘটনা দুটির কথা উল্লেখ করছি। তবে এ দুটি বাদেও প্রতিদিন যে কত এহেন ঘটনা ঘটে চলছে তার নেই ইয়ত্তা। আর ঘটনার মূলে থাকছে সেই মুসলিমরাই।

১। গত ২২ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার পশ্চি ম গাববেড়িয়া হাইস্কুল ও পার্শ্ববর্তী হিন্দুগ্রামে ব্যাপক হামলা চালায় কয়েক হাজার মুসলিম দুষ্কৃতী। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত স্কুলের চারজন মুসলিম শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের কাছে লিখিতভাবে স্কুল চলাকালীন একঘন্টা সময় চান নামাজ পড়ার জন্য। এছাড়াও তাঁরা স্কুলের উপরতলার একটি ঘরকে মসজিদ রূপে ব্যবহার ও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধেরও দাবি জানান। এ খবরে হিন্দু ছাত্রদের একাংশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওই শিক্ষকদের কাছে কিছু বলতে গেলে দু-জন শিক্ষক তাদের বেধড়ক পেটান। এ ঘটনায় সব হিন্দু ছাত্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। বেগতিক বুঝে ওই শিক্ষক দু-জন ফোন করেন বিভিন্ন মুসলিম গ্রামের মসজিদে, মোড়ল ও মাতববরদের কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যে হাজার হাজার সশস্ত্র মুসলিম দুষ্কৃতী ঝাঁপিয়ে পড়ে স্কুলের উপর। শুরু হয় ছাত্র-শিক্ষকদের উপর মারপিট এবং ভাঙচুর। অতঃপর হিন্দুগ্রামে ঢুকে চালায় অমানবিক অত্যাচার, মারামারি, লুটপাট ও ধর্ষণ। গর্ভবতী নারীরাও রেহাই পায়নি। হামলায় বহু মানুষ হয় আহত। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় তিনটি ক্লাব ও মন্দির।

(২) গত ১০ জুলাই মুর্শিদাবাদের নওদা থানার ঝাউবোনা হাইস্কুলে মুসলিম ছাত্ররা নামাজের জন্য টিফিনের সময় একঘন্টা করার দাবী জানায় প্রধান শিক্ষকের কাছে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই হিন্দু ছাত্ররা এর বিরোধিতা করে। ফলে ক্ষুব্ধ মুসলিম ছাত্ররা চড়াও হয় হিন্দু ছাত্রদের উপর। বেধে যায় সংঘর্ষ। পার্শ্ববর্তী মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে খবর পৌঁছে যেতেই মসজিদ থেকে মুসলিম ছাত্রদের উপর হামলার খবর প্রচার করা হয় এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলিমদের প্ররোচিত করাও হয়। উত্তেজিত কয়েক হাজার মুসলিম অতঃপর লাঠিসোটা, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হিন্দু বাড়িগুলির উপর। চলে যথেচ্ছ ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও শ্লীলতাহানি। বহু বাড়ি হয় ভস্মীভূত। এমনকী দু'জন হিন্দুকে হত্যা করা হয়। ঘটনার চার ঘন্টা পরে পুলিশ এলে আক্রান্ত হয় তারাও। মুসলিম হার্মাদরা এক ডি এস পি সহ ১৫ জন পুলিশকে জখম করে। গোটা নওদা ব্লক চলে যায় মুসলিম হামলাকারীদের দখলে। আকস্মিক ঘটনায় হিন্দুরা হয়ে যায় হতভম্ব। পুলিশ নিরপরাধ হিন্দুদেরও গ্রেপ্তার করেছে। উল্লেখ্য গত বছরও এই স্কুলে মুসলিম ছাত্ররা হাঙ্গামা চালিয়েছিল স্কুলের মধ্যে মসজিদ স্থাপন ও সরস্বতী পূজা বন্ধের দাবীতে। যদিও এই স্কুলের প্রায় ৯০ শতাংশ ছাত্রই হিন্দু। তবুও স্কুলে চলে আসা দীর্ঘদিনের সরস্বতী পূজা গতবার থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। আর এটা হয়েছে শান্তির স্বার্থে প্রশাসনের নির্দেশে।

উপরিউক্ত ঘটনা দুটি কি প্রমাণ করছে? না, প্রমাণ করছে, দেশটা হিন্দুস্থান হলেও বাস্তবে তা নয়। মাত্র ২০ শতাংশ সংখ্যালঘু মুসলিমরা চাইছে দেশটাকে মুসলিম রাষ্ট্রে এবং খৃস্টানরা চাইছে দেশটাকে খৃস্টান রাষ্ট্রে পরিণত করতে। আর ৮০ শতাংশ সহনশীল, অদূরদর্শী ও বিবেকহীন হিন্দুরা তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

নেতাজী ও গান্ধীজী

গত ৬ জুলাই ২০০৯ শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা ১৪১৬ নবকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেখা "বাঙালী সমাজে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক" পড়লাম। প্রবন্ধের শেষে (পৃ :৩৬) লিখেছেন, সেকালের নেতারা মুসলমানদের তোষণ করতেন এবং স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বোস নাকি মুসলমানদের তোষণ করেছিলেন।

তৎকালীন কংগ্রেসি নেতারা বিশেষ করে গান্ধী, নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীরা ক্ষমতা দখলের নেশায় দেশের অনেক

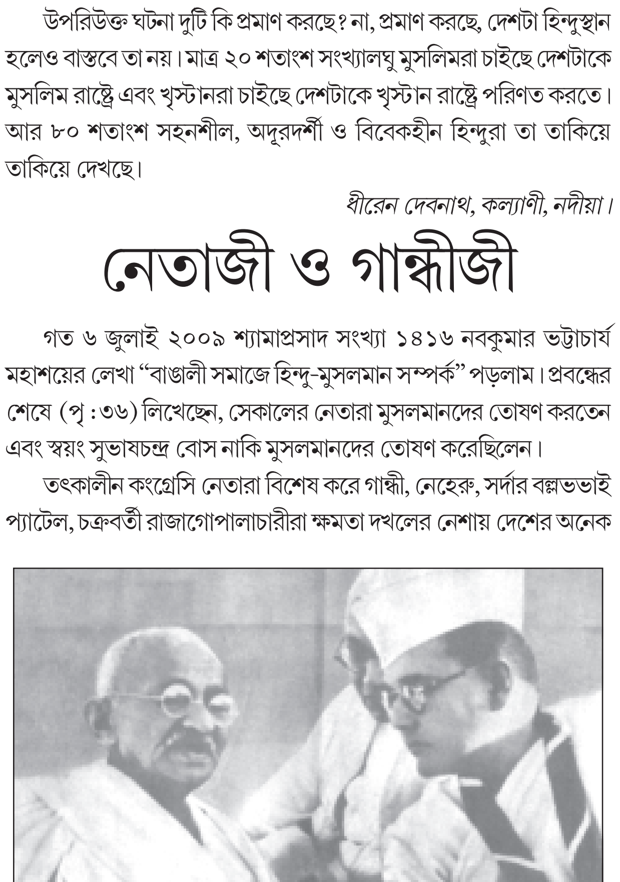

ক্ষতি করেছেন। মুসলমানদের তোষণের কাজ এখনও চলছে। কংগ্রেসি, অকংগ্রেসি সব রাজনৈতিক দল এ কাজ করে যাচ্ছেন।

কিন্তু নেতাজী সুভাষ বসুর ক্ষেত্রে মুসলিম তোষণের কথা খাটে না।

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতাজী বুঝতে পারছিলেন মিঃ জিন্না যে পথে হাঁটছেন তাতে অচিরেই হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি হবে। পরিণাম ভয়ানক হবে।

তাই হয়তো সুভাষ বসু জিন্নার সাথে কথা বলে থাকতে পারেন। কারও সাথে কথা বলে স্বমতে নিয়ে আসাকে তোষণ বলা যায় না।

গান্ধী, নেহেরু-র মুসলিম তোষণ ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ। আর নেতাজীর লক্ষ্য ছিল জাতীয় স্বার্থ। নেতাজীর মতো দেশভক্ত বিপ্লবীর জন্ম হয়েছিল বলেই ভারত স্বাধীন হয়েছে।

যে সময়ে জিন্না মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবী করেছিলেন, সেই সময় নেতাজী দেশের বাইরে ছিলেন। কংগ্রেসি নেতারা "কালনেমির লঙ্কা ভাগ" করেছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি , তিনি দেশ ভাগ রুখতে পারেননি। নেতাজী দেশে থাকলে দেশ ভাগ হতে দিতেন না।

বিশ্ব ত্রাস, হিটলার মুসোলিনী, তোজোর মতো নেতাদের নেতাজী স্বমতে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, জিন্না তো কোন ছার।

নেতাজীকে নিয়ে বহু লেখকের বহু বই আমি পড়েছি। তাছাড়া তাঁর জন্মদিনে সংবাদপত্রে বিশেষ লেখা প্রকাশিত হয়। লেখক যে কথা লিখেছেন তা কোথাও পাইনি। উনি খবরের কাগজের কথা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ খবরের কাগজের উপর নির্ভর করে এ ধরনের কথা লিখেছেন, যা মেনে নেওয়া কষ্টদায়ক।

অনিলচন্দ্র দেবশর্মা, কোচবিহার।

সংস্কৃত শিক্ষা

আমরা ভারতবাসী। আমাদের প্রাচীনতম ভাষা সংস্কৃত। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যুগ যুগ ধরে তাঁদের জ্ঞান, শ্রম, অধ্যাবসায় ও অক্লান্ত সাধনার দ্বারা পৃথিবীর একটি অন্যতম উন্নত ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন জগতবাসীর কল্যাণের জন্যে। এই ভাষা সংস্কৃত। মনে হয় বেদের ভাষা সংস্কৃত ভাষারই পূর্বসূরী। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি এক কথায় প্রাচীন ভারতের সব বৌদ্ধিক সাধনার প্রকাশ ঘটেছিল সংস্কৃত ভাষাতে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি সংস্কৃত ভাষার প্রতি কতটা আকৃষ্ট হয়েছিল তা বুঝা যায় যখন দেখি দু-জন জার্মান পন্ডিত অটো বোথলিংগ ছথব্ধব্ধপ্স চ্সব্ধড়ুপ্তুন্তব্ধসগ্ন এবং রূডোল্ফ রোথ সাত খন্ডে সংস্কৃত-জার্মান অভিধান ছত্ত্রব্দপ্সক্তজন্ব্ধ গুব্দবক্তজপ্প্ত বড়ব্দবব্ধত্রত্তক্তজত্তব্দগ্ন তৈরি করেছিলেন। ম্যাক্সমুলার তাঁর নিজের নাম সংস্কৃতে 'মোক্ষ মুলার' লিখতেন। এম মোনয়ার-উইলিয়মস্ একখানি সংস্কৃত ইংরেজী অভিধান ১৮৯৯ সালে তৈরি করেন। সেই গ্রন্থ মতিলাল বানারসি দাস কোং ভারতে ১৪ বার পুনঃমুদ্রণ করেছেন। শুদ্ধি করণও হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত কবি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটে সংস্কৃত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদনের চেষ্টা করেছেন। আমরা যে ভারতবর্ষকে খুব কম জানি বা ভাল জানি তার কারণ, এখন আমরা সংস্কৃত পড়তে পারি না ও বুঝতে পারিনি। এই ভাষাই হলো কয়েক হাজার বছরের ভারতকে দেখার একমাত্র আয়না। বিদেশীদের দ্বারা সংস্কৃতের অনুবাদ কতটা যে নির্ভরযোগ্য তা বিচার করার ক্ষমতাই বা কজনের আছে?

বর্তমানে আমরা যে দুর্বল ও হীনমন্যতার, কারণ প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই, তাঁদের পরিচয় আমরা ভুলে গেছি। এর কারণ ভারতবাসীদের রাষ্ট্র বিদেশীরা দখল করে ভারতে তাদের ভাষা চালু করে। ভারতীয় ভাষার তারা বিলোপ ঘটায়। ১১৯২ সালে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী দখল করার কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আরবী হরফে ফার্সী ভাষা ভারতে চালু হল। ইংরেজ রাষ্ট্র দখল করে চালু করে ইংরেজী। এই দীর্ঘকাল ধরে ভারতবাসী তাদের যে ভাষা হারাল, তার ফলে আজও তারা পূর্বপুরুষের পরিচয়হীন আত্মপরিচয়হীন এক হীনমন্য, দুর্বল, ক্ষয়িষ্ণু জাতি। এই সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পেতে দরকার ভারতবাসীকে তাদের নিজেদের ভাষার সঙ্গে পুনঃপরিচয় ঘটান। সরকার কি সাহায্য করবে?

কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট কেউই যে সংস্কৃত অনুরাগী, তার প্রমাণ পাই না। পণ্ডিত নেহেরু শৈশব থেকে বিলেতি স্কুলে। কমিউনিস্টরা বিদেশী গুরুর শিষ্য। কম্যুনিস্টরা চীন-রাশিয়ার প্রতি আকর্ষণ আর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার মনোভাব তৈরির চেষ্টা করেছে। ভারতবাসীর অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। সেই ক্ষতিপূরণের এক সঠিক পথ সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা।

সংস্কৃত ভারতীর উদ্যোগে কেষ্টপুরে ১৬.৭.০৯ থেকে ২৬.৭.০৯ পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় কথা বলার কার্যক্রমে নিয়মিত সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন বেশ কয়েকজন। জাতির মঙ্গলকর্মে অংশগ্রহণের জন্য সকলের অবদান শ্রদ্ধা সহ স্বীকৃত হোক।

কৃষ্ণকান্ত সরকার, ২০ বি, দমদম পার্ক, কলিকাতা-৫৫।

অবতার পুরুষের পিতা

কৃষ্ণজনক বসুদেব

নন্দলাল ভট্টাচার্য

অবতার পুরুষের পিতা তিনি। তবুও আক্ষেপ, কেন তাঁকে শুধু পুত্র হিসেবেই চেয়েছিলেন? কেন চাননি মুক্তি? মোক্ষ?

স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু যাঁকে ধন্য করেছেন পুত্র হিসেবে জন্ম নিয়ে, তাঁরও অভিযোগ, নিতান্ত প্রাকৃত জনের মতোই, কেন আমার ছ'ছটি সন্তানকে কেড়ে নিল প্রায় তাদের জন্ম মুহূর্তেই? কেনই বা বেদবিহিত যাগযজ্ঞ, বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম করা সত্ত্বেও ঈশ্বরের জনক-জননীকেও করতে হল কারাবাস? কেন সইতে হল তাঁদের কংসের ওই নির্মম অত্যাচার? কেন সইতে হল ছ'টি সন্তানের বিয়োগ ব্যথা? কেন? কেন?

এটাই বোধহয় জীব-জগতের নিয়ম। যা পাওয়া গেল তাতেই ধন্য হওয়া নয়। তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকা নয়, বরং যা পাওয়া যায়নি, তারই জন্য আক্ষেপ। তারই জন্য দোষারোপ করা। তারই জন্য দায়ী করা সর্বমঙ্গল মঙ্গলময় ভগবানকেই।

অবশ্য এও তো ঈশ্বরের লীলারই একটি রূপ। মায়াবদ্ধ এই সংসারে সবই অনিত্য, সবকিছুই অসার। এবং তা জানার পরও অন্তহীন ক্রন্দন। মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়া। অথবা এও তো শ্রদ্ধা ভক্তিরই প্রকাশের একটি রূপভেদ। যাকে ভালোবাসা হয়, যার ওপর নির্ভর করা হয়, বিশ্বাস করা হয়, তাকেই বলা হয় কটু কথা। তাকেই দায়ী করা হয় সব অঘটন — সব আশাভঙ্গের জন্য।

আর তাই তো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র রূপে পাওয়ার পরও সত্যমূর্তি যদুপতি বসুদেবের আক্ষেপ, কেন তাঁর দর্শন পেয়েও মোক্ষ চাইলাম না, মুক্তি চাইলাম না। কেন তাঁকে শুধু পুত্ররূপে চাইলাম। আবার পুত্ররূপে তাঁকে পেলেও কেনই বা হারাতে হল ছ'ছটি সন্তানকে? কেন বাস করতে হল কারাগারে? কোন পাপে এই শাস্তি?

অবশ্য এই জিজ্ঞাসা শুধু অবতার পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের নয়, এই জিজ্ঞাসা সমস্ত জীবকুলেরও। কেন, কিসের জন্য, বসুদেব, দেবকীর এই কারাবাস? কিসের জন্য সন্তান শোক?

উত্তর একটাই। কর্মফল। প্রারব্ধ। এর হাত থেকে রেহাই নেই অবতার পুরুষের পিতা-মাতারও। আর তাই ভোগের আগে তাঁদের ওই দুর্ভোগ।

বিগত জন্মে বসুদেব ছিলেন প্রজাপতি কশ্যপ। দেবকী ছিলেন তাঁরই স্ত্রী — অদিতি। একবার যজ্ঞ করার জন্য কশ্যপ অপহরণ করলেন বরুণের গাভীটিকে। শুধু অপহরণ নয়, একবারে আত্মসাৎ। যজ্ঞ শেষ হবার পরও তিনি ফেরৎ দিলেন না গাভীটিকে। বরং বরুণ সেটি চাইতে এলে সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তাঁকে করলেন রীতিমতো অপমান।

হতমান ক্রুদ্ধ বরুণ দিলেন অভিশাপ, গাভী হরণের জন্য আগামী জন্মে কশ্যপকে হতে হবে গোচারক — রাখালিয়া হবে তার বৃত্তি। আর যেহেতু গাভীটিকে অপহরণ করায় বরুণের গোশালায় কাঁদছে তার বাছুরটি। তাই সেই জন্মে কশ্যপকে হতে হবে মৃতবৎস। ভোগ করতে হবে সন্তান শোক।

কশ্যপ ভেবেছিলেন, পিতা ব্রহ্মা এই ব্যাপারে তাঁর পক্ষ নেবেন। কিন্তু কশ্যপের আচরণে ক্ষুব্ধ ব্রহ্মা কশ্যপের সহায় তো হলেনই না, বরং দিলেন অভিশাপ, কশ্যপ জন্মাবে যদুকুলে।

এইসব শাপ-শাপান্ত যখন চলছে, তখন সুযোগ পেয়ে গেলেন কশ্যপের আরেক স্ত্রী দিতিও। অদিতির পুত্র ইন্দ্র অন্যায়ভাবে তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে বিনষ্ট করেছিল। নষ্ট করেছিল অদিতির নির্দেশেই। তাই আগামী জন্মে অদিতিকেও সইতে হবে ছ'ছটি পুত্র শোক। আর সেই অভিশাপের ফলেই কশ্যপ ও অদিতি দ্বাপরে জন্ম নিলেন বসুদেব আর দেবকী রূপে। সেই কর্মফল বা প্রারব্ধের জন্যই অভিশপ্ত বসুদেব এবং দেবকীকে ভোগ করতে হয় কারাবাস। সইতে হয় সন্তান শোক।

আর তত্ত্বদর্শন, — দুঃখের আগুনে পুড়েই তো পাওয়া যায় প্রকৃত সুখের সন্ধান। বোঝা যায় তার আসল তাৎপর্য।

অবতার পুরুষের পিতা হলেও কৃষ্ণ ও বলরামকে কিন্তু খুব বেশিদিন কাছে পাননি বসুদেব। কৃষ্ণ-বলরামের শৈশব ও বাল্য কেটেছে গোকুলে নন্দালয়ে। কংস বধের পর বসুদেব অবশ্য ছেলেদের পৈতে এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

তারপর কিছুদিন মথুরায় থাকলেও কৃষ্ণ বেশিরভাগ সময়টাই কাটিয়েছেন হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থে। তারপর মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় পুরী নির্মাণ করলেও, সেখানেও তাদের খুব কাছে পাননি। দুই ছেলেই তখন সাবালক। তারা তখন তাদের কাজ নিয়েই ব্যস্ত।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের পর পাণ্ডবরা তখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। এমন সময় একবার হল কল্পক্ষয়ের মতো সর্বগ্রাসী সূর্যগ্রহণ। সেই গ্রহণ উপলক্ষেই কৃষ্ণ-বলরাম এবং দ্বারকাবাসীদের নিয়ে বসুদেব গেলেন কুরুক্ষেত্রে পুণ্যস্নানের জন্য। এলেন পাণ্ডবরা এবং তাঁদের অন্তরঙ্গজনরা। এলেন মুনি-ঋষি, ব্রাহ্মণ এবং নারদাদি ঋষিবৃন্দ।

পুণ্যস্নান শেষে সকলে যখন বিদায় নেবেন, সে সময় বসুদেব মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণদের চরণ বন্দনা করে জানতে চান, কী করলে কর্মক্ষয় হবে তাঁর। উত্তরে তাঁরা বলেন, কর্ম দিয়েই ক্ষয় হয় কর্মের। সেটাই শাস্ত্রের বচন। শ্রদ্ধার সঙ্গে সর্ব যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর অর্চনাই কর্মবন্ধন মুক্তির উপায়। সেটাই মুক্তি বা মোক্ষলাভের পথ।

তাঁদের কথায় বসুদেব ওই পুণ্যক্ষেত্রে তাঁদের দিয়েই করালেন পত্নী সংযাজ নামে এক যজ্ঞ। সে মহাযজ্ঞে তুষ্ট হলেন সকলেই।

বরুণ এবং দিতির অভিশাপের ফলে বসুদেব কিন্তু স্থায়ী সুখের মুখ দেখতে পেলেন না কোনও দিনই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কিছুদিন সকলেই ছিলেন বেশ শান্তিতে। কিন্তু তারই মধ্যে কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন যদুকুলের পরবর্তী প্রজন্ম। মুনি-ঋষিদের সঙ্গে এক সর্বনাশা রসিকতা করতে গিয়ে অভিশপ্ত হন তাঁরা। কৃষ্ণপুত্র শাম্বর পেটে লোহার মুষল বেঁধে তাকে গর্ভিনী সাজিয়ে তাঁরা মুনি-ঋষিদের কাছে জানতে চান, কেমন সন্তান হবে এর। সবকিছু বুঝতে পেরে তাঁরা অভিশাপ দেন, এই গর্ভিনী একটি লৌহ মুষল প্রসব করবে এবং তাতেই ধ্বংস হবে যাদবরা।

হলও তাই। প্রভাসে মত্ত যাদবরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ধ্বংস হল। সেই সময় বলরাম দেহত্যাগ করলেন। আর বনের মধ্যে কৃষ্ণের রাঙা চরণকে হরিণ ভেবে তাঁকে বাণবিদ্ধ করে জরা নামে এক ব্যাধ। মৃত্যুর আগে কৃষ্ণ তাঁর সারথি দারুককে দিয়ে দ্বারকায় পিতা বসুদেবের কাছে পাঠান এই দুঃসংবাদ। সেই সঙ্গে অর্জুনের হাতে স্ত্রীদের রক্ষার ভার দেবার কথাও বলেন তিনি। বসুদেব দ্বারকাতে বসে দারুকের মুখে শুনলেন, কৃষ্ণ আর নেই। নেই বলরামও। শুনলেন এক স্বজনঘাতী কাণ্ডেনিহত হয়েছেন যাদবরা। অসহায়, শোকমগ্ন বসুদেব সেই মুহূর্তে দেবকী ও রোহিণীকে নিয়ে চলে এলেন প্রভাসক্ষেত্রে। নিদারুণ শোকে সেইখানেই প্রাণত্যাগ করলেন বসুদেব। তাঁরই সঙ্গে সহমৃতা হলেন দেবকী, রোহিণীও। অবতার পুরুষের পিতা হয়েও বসুদেব হয়ে রইলেন এক বিয়োগান্ত নাটকের ব্যর্থ, হতভাগ্য নায়ক হয়েই।

তৃতীয় চক্ষুর শক্তি

চৈতালী চন্দ

যে চোখ দিয়ে আত্মা দেখে তাই তৃতীয় চোখ। একে দিব্যদৃষ্টিও বলা যায়। শুনেছি দেবতাদের ত্রিনয়ন, তাই তাঁদের দিব্যদৃষ্টির অবস্থান পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ডের ওপর দুই ভ্রূর মধ্যভাগে। এখানেই আত্মার অবস্থান। মানুষের ক্ষেত্রে এই পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড নষ্ট হয়ে যায়। যাদের নষ্ট হয় না তাঁদের দিব্যদৃষ্টি থাকে, তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড সূক্ষ্ম দর্শনের উৎস। শোনা যায় পাখিদের এই পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড থাকে, তাই তাদের জন্ম যে দেশেই হোক তারা পূর্বজন্মের মাতৃভূমিতে উড়ে উড়ে চলে আসে অর্থাৎ পূর্ব জন্মের কথা তাদের স্মরণে থাকে।

মানুষের ক্ষেত্রে তৃতীয় চোখ বুদ্ধির চোখ। এই চোখের তিনটি কাজ —

(১) বিশ্লেষণ করা।

(২) মনশ্চক্ষুর দ্বারা দর্শন করা।

(৩) ঠিকমতো বিচার করা।

তৃতীয় চোখ আমাদের অবচেতন মনের তালা খোলে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিদ্ধান্ত নেওয়া, বিচার করা, স্মরণ করার শক্তি, উপলব্ধি করার ক্ষমতা ইত্যাদি তৃতীয় চোখ থেকেই আসে। যার তৃতীয় চোখ যত পরিষ্কার তার এই ক্ষমতাগুলো তত বেশি। তৃতীয় চোখ আমাদের সুপ্ত শক্তির বিকাশ ঘটায়, শনাক্তকরণ বা Identify করতে শেখায়, will power বা ইচ্ছাশক্তি বাড়ায়, দ্রুত কোনও কিছু বুঝে নেবার ক্ষমতা তৈরি করে। বুদ্ধিজীবীদের বিচারশক্তি হল বড় শক্তি। এই শক্তি একমাত্র তৃতীয় চোখ থেকেই আসে।

অবচেতন মনকে তৃতীয় চক্ষু দ্বারা দেখার প্রক্রিয়া —

(ক) কোনও আরামদায়ক আসনে বসে

ঠিক যেভাবে আমরা টিভি বা ফিল্ম দেখি সেভাবে মনের পর্দায় ফিল্ম আনতে হবে এবং সেটা হবে অবশ্যই সব থেকে ভালো ফিল্ম।

(খ) এই ফিল্মটার কথা সর্বদা ভাবতে হবে, মনে করতে হবে এটাই আমার বাস্তব ফিল্ম। এই ফিল্ম আমাকে কার্যকরী করার জন্য উদ্যোগী হতে হবে।

(গ) এভাবে ফিল্ম দেখে ঘুমোতে যেতে হবে। এরপর মেমরি (স্মরণশক্তি) তৈরি হবে। আস্তে আস্তে ব্লু-প্রিন্ট অনুযায়ী জীবনের ফিল্ম বানানোর চেষ্টা করে যেতে হবে এবং সফলতা কোনও বাধা ছাড়াই আসবে। তবে মানসিক শক্তি তৈরি করতে হবে। এভাবে কোনও অসুস্থ মানুষও সুস্থ হতে পারে। হয়তো দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী অবস্থায় আছেন, খুবই অসুস্থ, ওঠার ক্ষমতা নেই। এই পদ্ধতি অনুযায়ী মনের পর্দায় ব্লু-প্রিন্ট এনে দেখতে শুরু করতে হবে — ভাবতে হবে বিছানা থেকে উঠে চলছি, ট্রেন ধরছি, বাসে চেপেছি, বাজারে যাচ্ছি, টেপ বাজাচ্ছি, গান শুনছি। বারবার এসব দেখার জন্য Mental exercise করতে হবে। তারপর হঠাৎ একদিন দেখবেন Calling bell বাজছে, ঘরে কেউ নেই দরজা খুলতে হবে — এই মুহূর্তে তার তৃতীয় চক্ষু তাকে শক্তি যুগিয়ে দিয়েছে। তিনি উঠে দরজা খুলে দিয়েছেন। তার অসুস্থতার পেছনে মানসিক দিকটাই ছিল প্রধান যেটা তার মস্তিষ্কে ব্লক তৈরি করেছিল। এজন্য তিনি উঠতেই পারছিলেন না। যখন তিনি তার তৃতীয় চক্ষুর প্রতি মনোনিবেশ করলেন তখন তার সুপ্ত ক্ষমতা ফিরে এল। তিনি আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলেন।

অনেক রোগের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি রোগের চিন্তা আমাদের সে রোগ এনে দেয়। অর্থাৎ মনের বাজনা শরীরে বাজে, কাজেই নিজেকে সুস্থ করার শক্তি আমাদের মনের ভিতরেই আছে এবং সেটা আছে আমাদের মেমরি ব্যাঙ্কে। মেমরি ব্যাঙ্ক-এর প্রভাব পড়ে শরীরের প্রত্যেকটি কোষে। তাই এর দরজা খোলা রাখার চেষ্টা করতে হবে। একে খোলা রাখার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি 'রাজযোগ'।

রাজযোগে বসে Soul Conscious হতে হবে — দেহকে সম্পূর্ণ ভুলে আত্মিক স্থিতিতে অবস্থান করতে হবে — সেই সময় ভাবতে হবে ঈশ্বরের কথা — পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর, শক্তির সাগর। এভাবে তাঁর গুণের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর ভালবাসা, গুণ, শক্তি সব আমার মধ্যে আসবে। শরীরের যে অংশে আমার রোগ হয়েছে তার ওপরও এই শক্তির প্রভাব পড়বে। এভাবে প্রতিদিন কিছুটা সময় এই অবস্থায় স্থিত থাকলে আধ্যাত্মিক শক্তি আসবে, Healing Power আসবে, আত্মশক্তি আসবে।

এই আধ্যাত্মিক শক্তি বা আত্মশক্তির প্রকম্পন (ভাইব্রেশান) অন্য অসুস্থ আত্মাদের ওপরেও দিতে পারি এবং তাদেরও সুস্থ করতে পারি।

‘টিপ শিল্প’ বাঁচিয়ে রেখেছে শিল্পাঞ্চলের কয়েকশো মহিলাকে

পায়েল বাগচী ঃ ব্যারাকপুর ।। আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। এদিকে পুজোর বাজার ধরতে নাওয়া-খাওয়া ভুলে ব্যস্ত “টিপ (বিন্দী)” শিল্পীরা। বছরের সারা সময় টিপ তৈরীর কাজ থাকলে পুজোর মরশুমে ব্যস্ততা

তুঙ্গে উত্তর চবিবশ পরগণার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের ফুলি রায়চৌধুরী, মুনকি দাস, ঝুমা মন্ডল, প্রিয়াঙ্কা আচার্য, সুলতা রায়চৌধুরীদের মতো মহিলাদের। সাংসারিক কাজকর্ম সেরে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তৈরি করে চলেছেন বিভিন্ন ডিজাইনের টিপ। হিন্দী ভাষা-ভাষী ছাড়াও মাদ্রাজী, চাইনিজ, মারোয়াড়ী, তেলেগু ঘরানার নানান নকশার টিপ তৈরী করেন “ওরা”। এদের পরিবারের কর্তারা বেশিরভাগই জুট মিলের শ্রমিক, কেউ কেউ আবার দিনমজুর। বছরের অর্ধেক সময় জুটমিল বন্ধ থাকে। ফলে সংসারে আর্থিক টানাপোড়েনও একটা সমস্যা। ফুলি রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, দশ বছরের অধিক সময় ধরে টিপ তৈরি করে চলেছি। কাঁকিনাড়ার মহাজনদের কাছ থেকে টিপের সকল সামগ্রী সংগ্রহ করে আনি। এরপর টিপ তৈরী করে প্যাকেটিং করে, পুনরায় মহাজনদের দিয়ে আসি। প্রতিদিন ৮ থেকে ১০ গ্রোস (১৪৪ পাতা ঞ ১ গ্রোস) টিপ তারা তৈরি করে। গ্রোস প্রতি মহাজনেরা দেন ডিজাইন অনুযায়ী চার টাকা অথবা পাঁচ টাকা। কয়েকশো পরিবারের মহিলারা আজ টিপ তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন। অন্যদিকে শ্যামনগর মন্ডলপাড়ার অপর এক গৃহবধূ ঝুমা মন্ডল জানিয়েছেন, বছরের অন্যান্য সময় কাজের চাপ অতটা থাকে না। কিন্তু দুর্গা পূজা, কালী পূজা ও অন্য ভাষা-ভাষীদের উৎসবের মরশুমগুলোতে বিরাম থাকার উপায় নেই। ঘরে বসে এই ধরনের কাজ মহিলাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র মহিলারা এই টিপ তৈরীর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। প্রিয়াঙ্কা আচার্য নামে এক গৃহবধূ জানিয়েছেন, আমাদের হাতে গড়া এই শিল্প রাজ্য ছাড়িয়ে দিল্লী, মুম্বাই, কেরল, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। এখন রাজ্যের বিভিন্ন কর্মসূচী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও মহিলাদের টিপ তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। শহরতলির বেলঘরিয়াতেও একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এমনকী শিক্ষা শেষে ওখান থেকে টিপ তৈরীর কাজের সুযোগ মিলছে।

শ্যামনগরে মহিলা পরিচালিত সংস্কৃত টোল

পায়েল বাগচী ঃ শ্যামনগর ।। আজ মহিলারা পিছিয়ে নেই, সমান তালে পুরুষদের সাথে টেক্কা দিয়ে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে বহু নারী। তেমনই এক অনন্য নারী

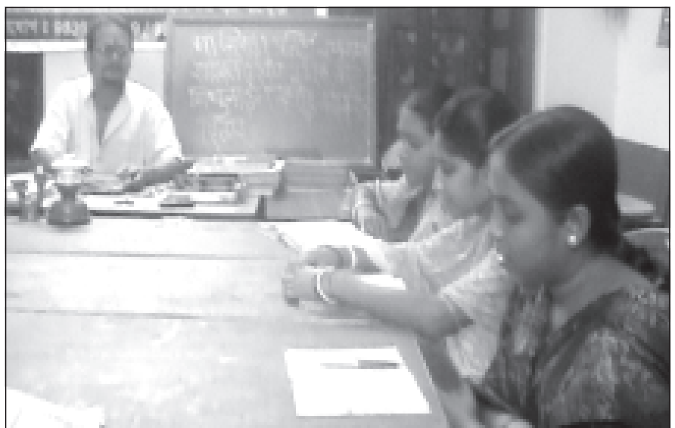

হলেন শ্যামনগরের রাহুতা গ্রামের শম্পা রায়। একদিকে স্বামী-সন্তান নিয়ে পুরোদস্তুর সাংসারিক ঝক্কি, অপরদিকে তার তত্ত্বাবধানে চলছে একটি সংস্কৃত টোলও। উত্তর চবিবশ পরগণার শ্যামনগরের “উত্তর প্রান্তিক সংস্কৃত শিক্ষা প্রচার সংস্থান” নামে একটি টোলের অধ্যাপিকা শম্পাদেবী। মোট ২০ জন মহিলা ওই টোলে শিক্ষা গ্রহণ করে চলেছে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যে। শিক্ষাগ্রহণ শেষ হলে পরীক্ষা নেওয়া হয়। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের “শাস্ত্রী” ও “আচার্য” প্রভৃতি উপাধি প্রদত্ত মানপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটি শম্পাদেবী চালাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর অনুমোদনে। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্য শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা পর্ষদের অন্তর্গত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাও শম্পাদেবী ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে থাকেন। তবে এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শম্পাদেবী নিজের বাড়িতে এর পাশাপাশি খুলেছেন একটি “আধুনিক টোল” ও। যেখানে কেবল সংস্কৃত নয়, স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন শম্পাদেবী এবং তার টোলের কিছু অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ। যারা প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে এই কাজ করে চলেছেন সমাজকে সফেদ করার লক্ষ্যে। বর্তমানে তার এই কর্মকান্ড শুধু শ্যামনগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। পার্শ্ববর্তী ইচ্ছাপুর, জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, নৈহাটী থেকেও ছাত্রছাত্রীরা আসেন শম্পাদেবীর কাছে। “শম্পাদির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা মানে ঘরে বসে আমার দিদির কাছে পড়া” — এমনই কথা জানালেন কাঁচরাপাড়া থেকে আসা মধুমিতা মজুমদার। আর এই মতকে সমর্থন করল মাম্পি সর্দার, সুজাতা চ্যাটার্জী, রিঙ্কু ভট্টাচার্যের মতো টোলের বেশ কিছু ছাত্রী।

শম্পাদেবী জানান, তার পরিবারের সদস্যদের সাহায্য ছাড়া তিনি এই কর্মযজ্ঞে আসতে পারতেন না।

চিত্রকথা ।। হনুমান ও ভীম ।। ১

নজরকাড়া দৃষ্টান্ত গড়লেন বকুল দেবী ও রেখা কালিন্দী

ইন্দিরা রায় ।। একটা সময়ে নারীর স্থান ছিল চার দেওয়ালের বদ্ধ ঘরে। অনেক সংগ্রাম করে নারী ফিরে পেল স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতা পেলেও তাদের জীবনে ছিল কঠোর সামাজিক অনুশাসন। কিন্তু মেয়েরা সুযোগ পেলে একদিন মনের সুপ্ত ইচ্ছেকে বাস্তবোচিত করতে পারে, তেমন দৃষ্টান্ত মেয়েরা স্থাপন করেছে নানাভাবে। একবিংশ শতাব্দীর নয়ের দশকে এক নজর কাড়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ছিয়াশি বছরের বকুল দেবী — বকুল চট্টোপাধ্যায় রেগুলার কোর্সে বি এ পরীক্ষায় বসে।

যে বয়স জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে, সেই বয়সে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উৎসাহব্যঞ্জক প্রেরণাদায়ক ঘটনা ঘটালেন তিনি। তিনি এক প্রেরণা। দৃঢ় মনোবল নিয়ে বয়সের ভারকে তুচ্ছ ভেবে দূরে সরিয়ে রেখে ছিয়াত্তর বয়সে উচ্চমাধ্যমিক এবং দশ বছর পরে ছিয়াশি বছর বয়সে স্নাতক পরীক্ষা দেওয়ায় এক ব্যতিক্রমী নজির গড়লেন বকুলদেবী।

তিনি এ ব্যাপারে জানালেন — আমাদের সময়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকলেও সে সুযোগ পাইনি। সে ধরনের পরিকাঠামো ছিল না। কিন্তু মনোগতভাবে আমি পড়াশোনা করতে চেয়েছিলাম। সেই সুপ্ত ইচ্ছাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম। তাই চেষ্টা চালিয়ে গেছি।

দক্ষিণ কলকাতার কাঁকুলিয়া রোডের বাসিন্দা নিয়মিত ক্লাস করেছেন সাউথ সিটি কলেজে। বাড়ি ফিরে সংসারের কাজ সামলে পড়াশোনা করা। গাড়ি করে নেতাজীনগর কলেজ ফর উইমেন কলেজে পরীক্ষা দিতে গেছেন।

এমন এক অননুকরণীয় অধ্যবসায় ও দৃঢ় ইচ্ছা বর্তমানে বিরল এবং পরবর্তীদের কাছে তিনি এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব।

আর একটা উদাহরণ, পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মতোই পড়াশোনা করতে যেত স্কুলে। মেয়েটি কাঠ-কুটো কুড়িয়ে ঘরের নানা কাজ করত। রাতারাতি সে হয়ে গেল জেলার গর্ব তথা দেশের গর্ব। স্কুল পড়ুয়া রেখা কালিন্দী।

সমাজের আদি প্রথামতে, কিশোরী রেখার বিয়ে ঠিক করেছিলেন বাবা-মা। সে কথা জানা মাত্র রেখা অল্পবয়সে বিয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সহপাঠীদের নিয়ে দল গঠন করে প্রচার শুরু করেছিল। ওর অনুপ্রেরণায় আরও দু'জন প্রতিবাদী সুনীতা মাহাতো ও আফসানা খাতুনকে রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল অসমসাহসিকতার জন্য পুরস্কৃত করেন। তিনজনের মধ্যে রেখা কালিন্দীকে বিজ্ঞান ভবনে দেশের রোল মডেল হিসেবে ঘোষণা করবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রক।

এই অনুষ্ঠানে রেখা তার জীবনে প্রতিবাদী হয়ে এক বিরল দৃষ্টান্ত গড়ল, যা অনুকরণীয়।

বি এড, পি টি টি আই এবং যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বাম শাসনে শিক্ষার অন্তর্জলি যাত্রা

অর্ণব নাগ ।। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রাক্তন উপাচার্যের কথা বোধ হয় অনেকেরই স্মরণে আছে। যিনি সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই-এর জঙ্গি আন্দোলনের চাপে তাঁর তিন বছরের মেয়াদকালের প্রায় পুরো সময়টাই বাড়িতে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজকর্ম সামলেছিলেন। তাঁর অপরাধ, তিনি আগমার্কা বামপন্থী ছিলেন না। সেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এস এফ আই-এর দৌরাত্ম্যে প্রশ্রয় দেবার কোনও প্রয়োজন বোধ করেননি। এই অপরাধে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেই ব্রাত্য ছিলেন সেই উপাচার্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই উপাচার্যের নাম সর্বজনবিদিত। তিনি সন্তোষ ভট্টাচার্য। এই খণ্ডচিত্রটিকে মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেললে দেখা যাবে, তেত্রিশ বছরের বাম-জমানায় শিক্ষাক্ষেত্রে একের পর এক নৈরাজ্যের ছবি ফুটে উঠেছে। ওই ছবির আড়ালে রয়েছে সিপিএমের বীভৎস এক সর্বগ্রাসী মুখ। যে মুখ পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই গ্রাস করতে উদ্যত। প্রাথমিক থেকে ইংরেজী তুলে দেওয়া, দীর্ঘদিন কম্পিউটার ঢুকতে না দেওয়া, দু'বছরের গ্র্যাজুয়েশন কোর্স চালু করা, তিন বছরের ডাক্তারী কোর্স চালু — একের পর এক বামশিক্ষা ব্যবস্থার তুঘলকি কান্ডে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সম্পৃক্ত আপামর রাজ্যবাসীরা। পরের পর শিক্ষা দুর্নীতিতে জড়িয়ে গেছে সিপিএম পার্টির নাম। মনীষা মুখোপাধ্যায় কেলেঙ্কারী থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ-এ দুর্নীতি সবেতেই এগিয়ে সিপিএম। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার বিগত তিন দশকে গোটা 'এডুকেশোনাল সিস্টেম'টাকেই পুরো 'পার্টি সিস্টেম'-এ পরিণত করেছে তারা।

শিক্ষা নিয়ে সিপিএমের এই ন্যক্কারজনক খেলা বহুদিন যাবৎ জনসমক্ষে উন্মোচিত। ছাত্র-যুব ভোট ব্যাঙ্ককে করায়ত্ত করতে তাই সিপিএমের নতুন 'এডুকেশোনাল পলিসি' গত এক দশক সময়ব্যাপী রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে লাগু হয়েছে। এই 'এডুকেশোনাল পলিসি'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বি এড, পি টি টি আই এবং অবশ্যই যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি। যুব কম্পিউটারের ব্যাপারটা যদিও কিছুটা আলাদা তবে সাম্প্রতিক হাইকোর্টের একাধিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এখন আর অন্য পলিসিগুলির তুলনায় ততটা আলাদা করে দেখা যাচ্ছে না এটাকে। ব্যাপারগুলো একটু তলিয়ে দেখা যেতে পারে।

১৯৯৩ সাল নাগাদ কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাশানাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন অ্যাক্ট তৈরি করেছিল। সেই আইন অনুযায়ী, কারিগরী ও পেশাদারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক ছাদের তলায় আনার জন্য সর্বভারতীয় কিছু সংস্থাকে সংবিধিবদ্ধ করা হবে যাদের অনুমোদন ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোনও ডিগ্রীই অবৈধ বলে গণ্য করা হবে। সেই মতো, কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে এ আই সি টি ই (অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন) এবং পেশাদারী শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে এন সি টি ই (ন্যাশানাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন) নামে দুটি সরকারি স্বশাসিত সংস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা হয়। রাজ্য সরকার সব জেনে বুঝে ন্যাকা সাজল। এন সি টি ই-র অনুমোদনের তোয়াক্কা না করে বিস্তর কলেজকে বি এড পড়ানোর অনুমতি দিয়ে দিল। চার বছর আগে এন সি টি ই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, '৯৩-এর পর থেকে এন সি টি ই-র অনুমোদন ছাড়া যে সব কলেজগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের 'বি এড' ডিগ্রী দিয়েছে এবং বি এড পড়াচ্ছে, পুরো ব্যাপারটারই আর কোনও মূল্য থাকবে না। সে যাত্রায় কোনওক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারকে ধরে-করে পরিস্থিতিটাকে সামাল দিল এই রাজ্যের বাম সরকার। তখন একটাই বাঁচোয়া ছিল, কলেজগুলি এন সি টি ই-র অনুমোদন প্রাপ্ত না হলেও, এন সি টি ই-র নিয়মাবলী অনুযায়ী-ই ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করেছিল।

কিন্তু পি টি টি আই নিয়ে সম্প্রতি যে গেরোয় পড়েছে রাজ্য সরকার তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মুশকিল। এন সি টি ই-র

পি টি টি আই নিয়ে অনশন বিক্ষোভরত ছাত্র-ছাত্রীরা।

নিয়ম অনুযায়ী, উচ্চ মাধ্যমিকে যারা পঞ্চাশ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে তারাই কেবলমাত্র প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং পাওয়ার যোগ্য। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের ২০০৭-০৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৯,৯৮৬টি। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াতে কমপক্ষে একজন লোক লাগলে স্কুলপিছু ন্যূনতম চারজন লাগার কথা। অর্থাৎ প্রায় দু'লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষক প্রয়োজন। এই চাহিদা মেটাতে শেষ পর্যন্ত এন সি টি ই-র নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ন্যূনতম মাধ্যমিকে যারা পাশ করেছে তাদের সবাইকে মোটা ক্যাপিটেশন ফি-র বিনিময়ে ভর্তি করা হলো। এই সমস্যা নিয়ে যখন ছাত্র সমাজ উত্তাল, সরকার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছে; ঠিক তখনই গত ৬ আগস্ট রাজ্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য ফের বিজ্ঞপ্তি জারি করল। আশ্চর্যের ব্যাপার, বিজ্ঞপ্তিটিতে ভর্তির সেই পুরনো নিয়মাবলী অপরিবর্তিতই রেখে দেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে হাইকোর্টের পি টি টি আই সংক্রান্ত রায়ের পরও সরকারের ঘুম ভাঙেনি। কিন্তু তাদের কূটবুদ্ধির অন্ত নেই। এন সি টি ই-র ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের একটি বিজ্ঞপ্তি'র দশ নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল, রাজ্য সরকারের সুপারিশের ওপর নির্ভর করে এন সি টি ই, পি টি টি আই সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে ছাড়ের বন্দোবস্ত করতে পারে। সেই সুযোগ নিয়ে রাজ্য এখন বলছে, উচ্চমাধ্যমিকে যারা পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর পেয়েছে তাদের ডিগ্রী যাতে বৈধ হয় তার ব্যবস্থা সরকার করবে। কিন্তু যারা উচ্চ মাধ্যমিকে পঞ্চাশ শতাংশ পাননি বা যাদের বিদ্যের দৌড় শুধু মাধ্যমিক অবধি তাদের কি হবে? ন্যাজে-গোবরে হয়ে এখন সরকারের সেই 'divide and rule' পলিসি কাজ করছে।

একদা কম্পিউটার ঢুকতে না দেওয়ার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজ্য সরকার ও সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে চালু হয়েছিল যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা ওই কেন্দ্রগুলিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বেশ ভালোভাবেই ছিল। সেগুলিতে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করানো হোত, ঠিক-ঠাক পরীক্ষাসূচীও গৃহীত হোত। এমনকী পরীক্ষার সময় 'এক্সটারনালরাও' আসতেন। সর্বোপরি পরীক্ষার রেজাল্ট ও সার্টিফিকেটও সময় মতো দেওয়া হোত। সব মিলিয়ে পরিপাটী একটা ব্যবস্থা। বিশেষ করে সার্টিফিকেটে রাজ্য সরকারের ছাপ থাকার দরুণ তার একটা গুরুত্ব অন্তত ছিল। এই পুরো গোছ-বন্দোবস্তটা হয়ত হাতে-নাতে সব জায়গায় (সেন্টারে) প্রয়োগ করা যেত না, সে তো কত সরকারী-বেসরকারী কলেজেই হয় না, কিন্তু খাতায়-কলমে বিষয়টার একটা অস্তিত্ব ছিল। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু গোল বাধল সরকারী অপদার্থতায়। ১৯৯৬ সাল থেকে সরকার এ ধরনের প্রকল্পে অনুমোদন দিতে শুরু করে। হাইকোর্টে দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী, ২০০৪ পর্যন্ত এ ধরনের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় নিয়মাবলী সমেত ফ্র্যাঞ্চাইজি খোলার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হোত। তাতে থাকত — ঘরের মাপ কত হবে, কটা কম্পিউটার থাকবে, একটা কম্পিউটার পিছু কতজন ছাত্র থাকবে ইত্যাদি। কিন্তু ২০০৪-এর পর থেকে এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি সরকার আর দেয় না। স্রেফ আবেদনকারীর আবেদনের ভিত্তিতেই তাদেরকে যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। সেই কারণে ২০০৪-এর পর অনুমোদন পাওয়া সব সেন্টারই অবৈধ। এই অভিযোগই করা হয়েছে কোর্টে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, সিংহভাগ যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রই চালু হয়েছে ২০০৪-এর পরে। পুরো মামলাটাই ঝুলে আছে হাইকোর্টে। সংশয়ের দোলাচলে প্রায় চার লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী।

সুতরাং এটা মানতেই হবে, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই এখন পঞ্চত্ব প্রাপ্তির অপেক্ষায় দিন-গুণছে।

অখণ্ড ভারত ভাবনা

।। রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।।

(গত সংখ্যার পর)

এখন আমরা বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে 'অখণ্ড ভারত' সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করব। এই প্রসঙ্গে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের একটি ঐতিহাসিক উক্তির কথা মনে আসে, "Impossible is a word to be found in the dictionary of fools." অর্থাৎ অসম্ভব শব্দ মুর্খের অভিধানে পাওয়া যায়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ভাগ করা দুই ভিয়েতনাম হো-চি-মিনের নেতৃত্বে এক হয়ে গেল। ১৭ বছর লড়াই লড়তে হয়েছে আমেরিকার মতো শক্তির বিরুদ্ধে, প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু হো-চি-মিন্ থামেননি। তিনি দুই ভিয়েতনামকে এক করে বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন। দুই জার্মানী পাঁচিল ভেঙে এক হয়ে গেল। দুই কোরিয়া এক হওয়ার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কাজেই ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ এক হবে বললে মহাভারত অশুদ্ধ হবে কেন? যারা পাকিস্তান বাংলাদেশের জনমানসের চিন্তাভাবনার খবরা-খবর রাখেন তাঁরা জানেন সেখানে "Unification of India" এই চিন্তার "চোরা স্রোত" বুদ্ধিজীবীমহলে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-মহলে দিনে দিনে প্রবল হচ্ছে। আগামী দিনে অখণ্ড ভারতের দাবী পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে উঠবে। ভারতের হিন্দুদেরও মানসিক ভাবে প্রস্তুত হতে হবে অখণ্ড ভারতকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য। আমাদের দেশে একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, "ঋষি বাক্য মিথ্যা হয় না।" ১৯৫০ সালে ঋষি অরবিন্দ মহাসমাধিতে যাবার আগে বলেছিলেন, A broken and fissured Independence has come. The partition shall and must go. India shall arise, Sanatan Dharma shall arise." ভাঙ্গাচোরা স্বাধীনতা পাওয়া গেছে। এই বিভাজনের অবসান হবেই, ভারত আবার অখণ্ড হবে। ভারত জাগবে, সনাতন ধর্ম জাগবে।

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মিলিত হলে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে এবং বহু নবতর সমস্যার সৃষ্টি হবে — তার কি হবে? আজ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যে পরিমাণ মুসলমান জনসংখ্যা আছে ঠিক সম-পরিমাণ মুসলমান ভারতে সুখে শান্তিতে ভারতের হিন্দুদের থেকে অধিকতর সরকারি এবং আর্থিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে বসবাস করছে। যার ফলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর লাখে লাখে মুসলমান ভারতে অনুপ্রবেশ করছে। ভারত থেকে কিন্তু কেউ পাকিস্তান বা বাংলাদেশে বসবাস করতে যাচ্ছে না। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অস্তিত্ব না থাকলে মুসলমানদের জেহাদী মানসিকতার অবসান হবে। ইসলাম মতের প্রতিষ্ঠাতা পয়গম্বর হজরত মহম্মদ বলে গেছেন যে, ইসলামের আয়ু ১৪০০ বছর। চান্দ্র হিজরী সালের হিসাবে তা হবে ইংরাজী ২০৩৮ সাল। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বসবাসকারী মুসলমানদের পূর্বপুরুষরা তো হিন্দুই ছিল। কয়েক পুরুষ আগেই তো তাঁরা উপাসনা পদ্ধতির বদল করেছেন। হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে উদার হৃদয় নিয়ে দু-হাত বাড়িয়ে তাঁদেরকে আবাহন জানালে পরাবর্তনের মাধ্যমে তাঁরা স্বধর্মে ফিরে আসবেন। "De-Islamisation" কি সম্ভব? বিশ্বের কোথাও কি এটা সম্ভব হয়েছে? উত্তর হ্যাঁ। ইউরোপের স্পেন দেশ মুসলমানরা দখল করে ইসলামীকরণ করে নিয়েছিল। ৮০০ বছর স্পেন মুসলিম শাসনে ছিল। যে স্পেন ইউরোপের মধ্যে অগ্রণী দেশ ছিল, ইসলামী শাসনে স্পেন পিছিয়ে যেতে লাগল। স্পেনের যুব সমাজ ঠিক করল স্পেনের অগ্রগতির জন্য স্পেনকে "De-Islamise" করতে হবে। সময় লেগেছে কিন্তু তারা থামেনি। প্রায় আড়াই হাজার মসজিদ চার্চে রূপান্তরিত হল। আজ স্পেন খৃস্টান দেশ। স্পেনে সম্ভব হয়েছিল ভারতে তা সম্ভব হবে না কেন? ভারতেও তা সম্ভব হবে। তার জন্য চাই আকাশের ন্যায় উদার হৃদয় সম্পন্ন, দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ সংগঠিত হিন্দু সমাজ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সেই কাজ দেশব্যাপী দ্রুত সফলতার সঙ্গে করে চলেছে। ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ এক হলে, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, আফগানিস্তানও ক্রমশ ভারতে সামিল হবে। অলমিতি বিস্তারেন।

(লেখক আর এস এস-এর পূর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রীয় সঙ্ঘচালক)

খেলার জগৎ

দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বলরামরা

।। জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

দেশের হয়ে অলিম্পিকে সেমিফাইনালে খেলে প্রতিদান বাবদ ২৫,০০০ টাকা অনুদান, তাও কিনা ৫৩ বছর বাদে! এই দেশের ক্রীড়া সংস্কৃতি ঠিক কোন খাতে বয়ে চলেছে এই ঘটনাই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। এ যাবৎ কালের সর্বোত্তম ভারতীয় ফুটবলীয় কীর্তিকে এভাবে অপমান করার অধিকার কে দিল এ আই এফ এফকে। সমর (বদ্রু) ব্যানার্জির নেতৃত্বে যেমন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে খেলে ভারতীয় ফুটবলাররা ১৯৫৬-র মেলবোর্ন অলিম্পিকে সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠে গেছিলেন, তেমনই দৃপ্তচিত্তে আলবার্তো কোলাসোর প্রেরিত ২৫,০০০ টাকার চেক ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন দিল্লীর ফুটবল হাউসে।

মাস কয়েক আগে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী এম এস গিল ৫৬-র অলিম্পিকে খেলে আসা সব জীবিত ফুটবলারদের দিল্লীতে ডেকে যেভাবে সম্বর্ধনা ও স্বীকৃতি দিয়েছেন, তা দেখে অভিভূত ভারতীয় ফুটবল সমাজ। ওই সম্বর্ধনা থেকে কিছুই শিক্ষা নেয়নি ফেডারেশন কর্তারা। যে সোনার টুকরো ছেলেরা বিশ্ব মঞ্চে দেশের গৌরব বাড়িয়ে এলেন, ভারতীয় ফুটবলকে বিশ্ব সমাজে সম্মানজনক অবস্থানে মেলে ধরলেন, তাঁদের এভাবে হেয় করার অধিকার কে দিল ফেডারেশনকে। কোলাসো, প্রফুল্ল প্যাটেলরা কি জানেন বাঙালী জনমানসে প্রদীপ ব্যানার্জি, নিখিল নন্দী, বলরামদের কতখানি গুরুত্ব ও ভালোবাসা সঞ্চারিত হয়?

ঠিকই বলেছেন অধিনায়ক বদ্রু। 'আমরা কখনই অর্থ প্রাপ্তির জন্য দেশের হয়ে খেলিনি। তখন খেলে টাকাকড়ি কিছুই পাওয়া যেত না। টাকার থেকে অনেক দামি আলিম্পিক খেলার সম্মান, মর্যাদা আর আপামর দেশবাসীর ভালোবাসা। খেলা তখন অর্থকরী শিল্প হয়ে ওঠেনি বলেই ভারত অলিম্পিক সেমিফাইনাল খেলতে পেরেছিল। এশিয়াডে সোনা জেতা সম্ভব হয়েছিল।'

কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে সাংবাদিকদের নিজের ও সকলের মনের কথাটাই অকপটে বলে দেন বদ্রু। তবুও মন্দের ভাল যে ক্রীড়ামন্ত্রী ও তাঁর দফতরের আমলারা জাতীয় গৌরব ওই ফুটবলারদের প্রাপ্য সম্মান দেরিতে হলেও দিয়েছেন। ওই দলের একমাত্র প্রদীপ ব্যানার্জি পদ্মশ্রী পেয়েছেন। বাকীদের

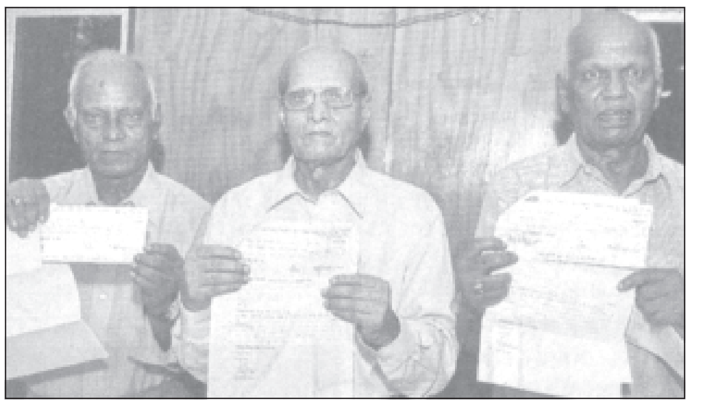

চেক ও প্রতিবাদপত্র হাতে বাঁ দিক থেকে নিখিল নন্দী, বদ্রু ও বলরাম।

কয়েকজন অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন। দলনেতা বদ্রু তো তাও পাননি।

যে দেশে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ছয় দশক পরও জাতীয় ক্রীড়ানীতি তৈরি হয় না, সে দেশে খেলোয়াড়দের চিন্তা-চেতনা উপলব্ধি করবে কোন সরকার। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী অলিম্পিকের মাহাত্ম্যই বোঝেন না, কনফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ান বিশ্বশ্রেষ্ঠ ব্রাজিলের অধিনায়কের জার্সি হাতে পেয়েও যাঁর চিত্ত শিহরিত হয় না, হৃদয় আবেগে প্লাবিত হয় না, সে দেশের জীবনচর্চায় খেলার স্থান কোথায় তা সহজেই অনুমেয়। বিশ্ব অলিম্পিক বা ফিফার বিশ্বকাপ চলাকালীন সব উন্নত দেশের রাষ্ট্রনেতারা সরাসরি মাঠে হাজির থেকে উৎসাহ, অণুপ্রেরণা দেন নিজ দেশের ক্রীড়াবিদ খেলোয়াড়দের। তাতে বাড়তি উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে প্রতিযোগীদের হৃদয়-তন্ত্রীতে। সেরা পারফরমেন্স বেরিয়ে আসে, দেশ ও জাতি গৌরবান্বিত হয়, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতেও তার বহু- পাক্ষিক প্রভাব দেখা যায়।

তাই ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণযুগের নায়কদের যতই হতাশা এসে গ্রাস করুক, এই অবস্থা তাদের মেনে নিতেই হবে। অলিম্পিকে পরপর সোনাজয়ী হকি খেলোয়াড়দের এদেশ কি দিয়েছে। কে ভি সিং বাবু এই হতাশা থেকেই আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁর হয়ত আর্থিক অস্বচ্ছলতা ছিল না। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত, রাষ্ট্রীয় মর্যাদা তাঁকে দেয়নি এদেশের সরকার। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে সেদেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়াদ্যুতি জৈলমস পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এই 'জৈলমস' পুরস্কার সিনেমার অস্কারের সমতুল্য। ইংল্যান্ডে ধ্যানচাঁদ, রূপ সিংহের নামে স্টেডিয়াম, রাস্তার নামকরণ হয়েছে। এদেশে তারা কি পেয়েছেন? ভারতরত্ন দেওয়া হয়নি ধ্যানচাঁদকে। লেসলি ক্লডিয়াস চারটি অলিম্পিক খেলেছেন। তিনটিতে সোনাজয়ী দলের সদস্য। একবার অধিনায়কত্ব করেছেন। বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সেন্টার হাফ লেসলি ক্লডিয়াস যদি অস্ট্রেলিয়া সরকারের আহ্বানে সে দেশে চলে যেতেন, তবে রাজার হালে দিন কাটাতে পারতেন। অথচ তাকে কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে থাকতে হয়। লেসলি ক্লডিয়াস থাকার জন্য পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের কাছে এক চিলতে জমি চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। আর তাঁর সঙ্গে কোনওভাবেই তুলনায় আসেন না ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি, তিনি ব্যবসার জন্য সল্টলেকে একাধিক প্লট পেয়ে যান। ক্লডিয়াস যে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, বামফ্রন্টের মোসাহেবী করেন না। তাই এরাজ্যে তাঁর কিছুই পাওয়ার কথা নয়। ক্লডিয়াসের যদি এ হাল হয়, তবে বলরাম, বদ্রুদের ক্ষেত্রে যা হয়েছে,তা প্রত্যাশিতই। তাঁরা মাথা উঁচু করে খেলেছেন, কর্মক্ষেত্রেও মাথা উঁচু করে কাজ করেছেন। তাই ফেডারেশনের নামমাত্র অনুদান, যা প্রকারান্তরে ভিক্ষাবৃত্তির নামান্তর ফিরিয়ে দিয়ে নিজেদের মান-মর্যাদা ও মূল্যবোধকে ধরে রাখতে পেরেছেন। পি কে ব্যানার্জি অবশ্য জীবনে অনেক স্বীকৃতি পেয়েছেন। শুধু এদেশ থেকেই নয়, আন্তর্জাতিকস্তরেও অনেক স্বীকৃতি, সম্মান পেয়েছেন। তাঁর মতো সৌভাগ্যবান চুনী গোস্বামীও। অথচ তাদের সম মানের প্রতিভাবান তুলসিদাস বলরামকে কি দিয়েছে এই দেশ। অভিমানে বলরাম ফুটবল জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, নির্জনে অন্তরালে থেকে দিন কাটাচ্ছেন। এই বৈষম্য, এই অবহেলা নিয়েই বাঁচতে হবে অলিম্পিয়ানদের!

শব্দরূপ - ৫১৯

বিশাল গুপ্ত

১		২	■	■	৩		৪
■	■	৫	৬			■	
■	৭	■		■	৮		
৯		১০		■		■	■
■	■		■	১১		১২	
১৩			■		■		■
	■	১৪			১৫	■	■
১৬			■	■	১৭		

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. বিশেষণে গভীর শব্দের প্রতিশব্দ, অতলতল, অগাধ, আগাগোড়া দ্বিত্বে অগ্নি শিখার প্রজ্বলনের আওয়াজ, ৩. বেমানান, বিসদৃশ, শেষ দুয়ে ধাপ্পা, ৫. ফারসি মূল শব্দে ভিত্তিমূল, ছয়ে-চারে হিন্দী শব্দে ঘুম, ৮. অর্থাদির প্রাপ্তি স্বীকার পত্র, ৯. বৈদ্য, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, ১১. ক্রিয়া বিশেষণে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে, একে-চারে পঙক্তি, ১৩. না থাকা, অনটন, ১৪. বিশেষণে প্রণয়ভাজন, ১৬. মেয়ে, ১৭. ধুনে জ্বালাবার পাত্র।

উপর-নীচ ঃ ২. "— বসন্তের দানের ডালি রবীন্দ্রসংগীত, ৩. প্রয়োজনীয় নয় এমন, নিষ্প্রয়োজন, ৪. ব্রত পালনের জন্য কেবলমাত্র শাকপাতা যার এমন, প্রথম দুয়ে তৎসম গাছের পাতা, ৬. কাহিল, নির্জীব, হীনবল, ৭. ডিম্পল-এর বিখ্যাত ছবি, ১০. রামচন্দ্রের পত্নী সীতা, একে-তিনে মাতগুড়, ১১. বিষ্ণু, বলরাম, আগাগোড়া সপ্তম সংখ্যা, ১২. সম্মতি, সমর্থন, ১৩. 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের এক ব্যারিস্টার, ১৫. পুষ্পরস।

সমাধান শব্দরূপ ৫১৭

■	ভু	ক	ম্প	ন	■	■	মা
সৃ	ষ্টি	■	■	ম	■	■	ন
■	না	■	■	ক	স	র	ত
পা	শ	ব	■	■	রে	■	■
■	■	ং	■	■	স	ভ	য়
প	রা	শ	র	■	■	স	■
কি	■	■	দ	■	■	ভ	গ্ন
জা	■	■	ন	ব	র	স	■

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।
সত্যেন মন্ডল
নলহাটী, বীরভূম।
ডঃ শান্তনু গুড়িয়া, বাগনান, হাওড়া।

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন'শব্দরূপ'।

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সংখ্যায়।

ওয়াডা-বোর্ড বিতর্ক, ক্রিকেটাররাই দায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ক্রিকেট অলিম্পিক গেম হোক, তা বোধ হয় ক্রিকেটাররাই চান না। নিজেদের ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে দায়বদ্ধ ক্রিকেটাররা। সাম্প্রতিক ওয়াডা-বোর্ড বিতর্কের প্রেক্ষিতে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। দুনিয়ার সব খেলার তামাম ক্রীড়াবিদ, অ্যাথলিটরা ওয়াডা চুক্তি মেনে চলে, ক্রিকেটাররাই কেবল তার ব্যতিক্রম। আই ও সির অনুমোদিত আন্তর্জাতিক ডোপিং নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সংক্ষেপে ওয়াডার ক্লিন চিট না পাওয়া পর্যন্ত কোনও ক্রীড়াসংস্থা বা ক্রীড়াবিদ জাতে ওঠে না একথা কি ধোনির টিম বোঝে না।

ওয়াডার নির্দেশ মেনে ডোপিং সংক্রান্ত শর্তাবলী থাকলে অসম্মত ধোনি, যুবরাজ হরভজন সহ ভারতীয় দলের যে কয়েকজন ক্রিকেটার। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য দেশের ক্রিকেটাররাও বেঁকে বসেছে। আসলে বিশ্ব ক্রিকেটে সবচেয়ে ধনী সংগঠন বি সি সি আই। ক্রিকেট খেলিয়ে কোনও দেশই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে তাই চটাতে চায় না। ভারতে টেস্ট বা টুর্নামেন্ট খেলতে এলে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, তা অন্য কোথাও খেলে পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই ভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা

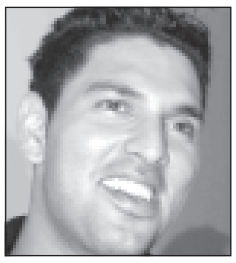

ক্রিকেট বোর্ড ইচ্ছা থাকলেও ওয়াডা চুক্তিপত্রে সই করতে পারছে না।

ক্রিকেটারদের থেকে হাজার গুণে পেশাদার ও ধনী টেনিস তারকা, ফর্মূলা ওয়ান প্রতিযোগী, বক্সার, ফুটবলার, বাস্কেটবলার কে নেই এই তালিকায় যারা ওয়াডার নীতি নির্দেশিকা মেনে চলে না। সব সংস্থা, সব ক্রীড়াবিদই চায় তাদের কীর্তিকলাপ অলিম্পিকের দৃষ্টিকোণে চুলচেরা মূল্যায়ণ করতে। অলিম্পিকে পারফর্ম করাই জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য ও স্বীকৃতি। আর তার জন্য ওয়াডার ক্লিনচিট বা ছাড়পত্র প্রয়োজন। যে কোনও খেলার স্বচ্ছতা ও সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণে ওয়াডার স্বীকৃতি ও ছাড়পত্র আবশ্যক। এটা আই ও সির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। ক্রিকেট ও ক্রিকেটাররা এই নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে সমকাল ও ভাবীকালকে এক বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

৮/৯টি দেশের মধ্যে টেস্ট ও একদিনের ম্যাচ খেলেই ফুরিয়ে যাচ্ছেন ক্রিকেটাররা। বৃহত্তর জীবনালোকের ক্যানভাসে নিজেদের মেলে ধরার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও হারালেন তারা। ২০১০-র এশিয়াডে ক্রিকেটের অন্তর্ভুক্তি একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গেছে। তারপর ২০১২-র লন্ডন অলিম্পিকে ক্রিকেট প্রদর্শনী খেলা রূপে অন্তর্ভুক্ত হ'ত। তারপর থেকে প্রতিযোগিতামূলক খেলা হিসেবে প্রতিটি অলিম্পিকে ক্রিকেটকেও দেখা যেত। অথচ ওয়াডার সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে ভারতীয় বোর্ড ও তাদের সমর্থনকারী আই সি সি ক্রিকেটের বিশ্বায়নের সম্ভাবনায় ইতি টেনে দিলেন।

অথ মর্মর মূর্তির কান্নার কথা

বিশাখা বিশ্বাস

কে কাঁদে এমন করে এত রাতে?....

সিঙ্গুরের কিশোরী তাপসী আর উপোসী চাষীদের কান্না নয়নজুলি আর জুলকি নদীর জলের বুকেই তো কবে মিলিয়ে গেছে জল-বুদবুদের মতো। নন্দীগ্রামের মা-বোনেদের সিঁদুরের টিপ্ হলদি নদীর জলকে কবেই তো লাল করে দিয়েছে। ইবসেন-পেরেদেল্লা-ব্রেশতের নাটকে নটবরের শেকল ছাড়া গ্রে-হাউন্ডগুলোর আঁচড়ে-কামড়ে গিরিবাসী বনবাসী কুমারী কন্যাদের বুকের লজ্জা চোখের জলের বদলে আগুন হয়ে রাবণের চিতার মতো সেই কবে থেকে জ্বলছে, সেই চিতাগ্নিতে জ্বলছে মঙ্গলকোট, জ্বলছে নানুর। তবু এখন তো আর কাঁদে না কেউ। কেননা তাপসীর পোড়া চুলের গন্ধেও দমেনি সিঙ্গুর। বোয়ালের পেটে গৃহবধূর পলাপরা হাত দেখেও টলেনি নন্দীগ্রাম। কুমারী কন্যারা তাদের বুকের লজ্জা শত দুঃখেও বাইরে এনে লালগড়ে হারেনি। ঘর পোড়ানো আগুন নিভে গেলেও মানুষের নয়নাগ্নি এখনো জ্বলছে মঙ্গলকোটে, নানুরে। ভরা বর্ষার এই বৃষ্টি ভেজা রাতে তবু কে কাঁদে এমন করে?...

ক্লাবঘরের ভাঙা বেঞ্চের ওপর নিদ্রারত নেতা গগনাচার্য ধড়-ফড়িয়ে উঠে অনতিবিলম্বে সখা ও সংগ্রামী সাথী সবুজ, অনন্ত, বিনম্র, অননুপম এবং বৃন্দাবনীকে সাথে নিয়ে বৃষ্টিঝরা সেই রাতে 'টাটাবাবা'-র সুমো গাড়ীতে চেপে সকলে উপস্থিত হলেন কার্লমার্ক্স সরণির মহামতি সেই মার্ক্সের পদতলে। কিন্তু এ কেমন কাণ্ড? 'অঘটন কী আজো ঘটে' (চলতি প্রবাদ)? সত্যিই কী 'এভরিথিং ইজ পসিবল' (হাক্সলে)? সত্যি সত্যিই কী 'নাথিং ইজ ইমপসিব্‌ল্ (জেমস জীন)? মহান মার্ক্সের সেই মর্মর মূর্তি কাঁদছেন।... সে কান্নায় সকলেই কাঁদলেন। কান্না-শেষে সকলের নেতা গগনাচার্য বললেন, কমরেডাচার্য কেঁদো না, আমি সকলকেই বলেছি আবার আমরা বাংলার মানুষের কাছে যাবো .... আবার আমরা মানুষের ক্ষমা চেয়ে নেবো, আবার আমরা ঘুরে দাঁড়াবো ... আবার আমরা থার্ডফ্রন্ট (থুড়ি) তৃতীয় বিকল্প গড়ে তুলবো, আবার ....

তাকে বাধা দিয়ে বৃন্দাবনী বললেন, তাই মুখের বদলে মঙ্গলকোটে আমরা কাজে দমদম দাওয়াই দিচ্ছি। বিনম্র বললেন, বাংলা বন্ধের দিন কংগ্রেসকে যা ইচ্ছে তাই করার অনুমতি দিয়ে কার্যত আমরা বাংলাকে আবার 'পাছা' দেখিয়েছি। অনন্ত বললেন, আমি তো মানুষকে তের টাকায় সস্তার আলু খাওয়াচ্ছি। অননুপম বললেন, ট্রেড সিক্রেটের তত্ত্ব আপাততঃ তাই আমি গুটিয়ে নিয়েছি।...

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে মর্মর মূর্তি ঘুরে দাঁড়ালেন। তার 'পাছা'-র পশ্চাদ্দেশে দাঁড়িয়ে সকলে ভাবলেন এবার তাঁদেরও ঘুরে দাঁড়াবার পালা। তাঁরাও তাই ঘুরে দাঁড়ালেন। অননুপম বললেন, অতঃ কিম্ কর্তব্যম্? নেতা গগনাচার্য কর্তব্য নিরূপণ করে মর্মরমূর্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, দুনিয়ার গুরু, আপনার কান্নার কারণটা বলুন।...

এবারে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মর্মর মূর্তি। সংক্ষেপে সকাতরে বললেন, তোরা হিটলারের দোসর, তোজোর কুত্তা, রিবেনসনের বেড়াল, জনযুদ্ধের বামন, বার্মার পতিতাপল্লীর লম্পট, কুইসলিং বোসকে দিয়েছিস কী বাহারী ঘোড়া, আর বত্রিশটি বছর আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস এই থামে (স্তম্ভে)। তা আমি না কাঁদলে কে কাঁদাবে এই ভরা শ্রাবণে?....

তখন সকলে ঘোড়ার ব্যবস্থাকল্পে দ্রুত ভগবান তথাগতের শরণাপন্ন হলেন। নিশুতি রাতে ডাক শুনে ভগবান তথাগত শয্যা ত্যাগ করে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলেন। আবার কী কোথাও যৌথবাহিনী দরকার? কোনও কমরেড হল অপহৃত? বৌবাজার এবং শেয়ালদহে আবার কী 'ওরা' ঐক্যবদ্ধ হল? তখন সকলে তাঁকে সব খুলে বললেন। তিনি আশ্বস্ত হলেন। তথাগতজী বললেন, সামান্য ঘোড়ার জন্যে দুনিয়ার গুরুর কান্না! বত্রিশটি বছর ধরে মানুষকে আমরা 'বাতেঁ ভুল-ভুলাইয়া' রেখেছি। ৩০ আগস্ট ১৯১৮ সালের লেনিনজীর সেই বিখ্যাত 'লং লিভ রেড টেরার'য়ের কায়দায় বত্রিশটি বছর আমরা সারা রাজ্যে 'মাস টেরর'কে কায়েম রেখেছি (লেনিন, সি ডব্লিউ, ভলি এল, পেজ ওয়ান ফোর টু)। মেনশেভিকদের সংবাদপত্র 'দ্য ওয়ার্কার্স পেপার' এবং 'নিউ রে' পত্রিকাগুলির ওপর রুশী মার্ক্সবাদীদের দমনপীড়নের ইতিহাসের মতো ক্ষমতায় এসে আমরাও 'আনন্দপত্র'-কে পুড়িয়েছি, 'স্টেটসম্যানশীপ'-কে বয়কট করেছি, 'অনতীত বর্তমানকে' ধমকেছি, ইদানীং 'সংবাদ প্রত্যহ'কেও চমকাচ্ছি (আনটাইমলি থট্‌স্, গোর্কী)। বত্রিশটি বছর ধরে 'রক্ত ও মাংসের ওপর সমাজবাদের জন্যে লেনিনের গবেষণার মতো' আমরাও নিহত মানুষের লাসের বুকে পা রেখে 'মার্ক্সবাদী পুঁজিতন্ত্রের' ওপর রিসার্চ করে চলেছি (রুশী নিউ এজ, গোর্কী, ৭-১১-১৯১৮ সাল)। সমাজতন্ত্রের জগৎগুরুকে আমরা সামান্য একটি ঘোড়া দিতে পারবো না? এক্ষুণি চলুন যাই — 'কিছু করে দেখাই', ডু ইট নাউ।...

তখন 'গণবাজার' নামক প্রিন্ট মিডিয়ায় এবং 'চতুর্বিংশ প্রহর' নামের ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সেই খবর পাঠিয়ে সকলে সেই মর্মর মূর্তির পাদদেশে গিয়ে দাঁড়ালেন। গগনাচার্য আত্মতৃপ্তিতে বললেন, দুনিয়ার গুরু, দেখুন কাকে এনেছি! সহসা সেই মূর্তি উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলেন। তারপরই অকস্মাৎ তার চোখ দুটোতে যেন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-খেজুরি-লালগড় আর নানুর-মঙ্গলকোটের চিতাগ্নির অগ্নিঝলক ঝলসে উঠলো। ক্ষুব্ধকণ্ঠে গগনাচার্যকে সেই মূর্তি বললেন, তোদের কাছে আমি আশা করেছিলাম একটি সবল আরবীয় অরভ (অশ্ব) কিম্বা তুর্কমেনিস্তানী কোনও টাট্টু ঘোড়া তা তোরা নিয়ে এলি এক ধোপার...

সেদিন ২৪ প্রহর নামক মিডিয়াটি সেই সংবাদকে সেন্সর করলো, গণবাজার নামক পত্রিকাখানি সেই খবরকে খুন করলো, গগনাচার্য কেবল বললেন, এমন কোনও খবর ওভার ফোন আমি পাইনি, শুনেছি 'স্বস্তিকা' নামক এক অখ্যাত পত্রিকা নাকি খবরের নামে এক খাস্তা বানিয়েছে, ইয়াহি অল্লা।...

(ইয়াহি অল্লা শব্দ যুগল হিন্দু শাস্ত্রোক্ত। শ্লেষকে তীব্রতর করার জন্যে 'ধোপা' শব্দটির ব্যবহারের জন্যে রজক ভাইদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী — লেখিকা)

সমাবেশ সমাচার

ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনার বার্ষিক সভা

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনার বার্ষিক সাধারণ সভা এই বছর অনুষ্ঠিত হল কর্ণাটকের হসপেটে শহরে। গত ১৮ ও ১৯ জুলাই দুইদিন ব্যাপী সভা অনুষ্ঠিত হয়। হসপেট শহরই প্রাচীন বিজয় নগর। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের রাজ্যাভিষেকের ৫০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই স্থানটিকেই ইতিহাস সঙ্কলন সমিতির সভার জন্য নির্বাচন করা হয়। বাংলা থেকে পাঁচ জন প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অন্যান্য প্রদেশ থেকেও প্রতিনিধিরা উপস্থিত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের অধ্যক্ষ ডঃ শিবাজী সিংহ। সহ-সভাপতি ছিলেন ডঃ সতীশ মিত্তাল। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সংগঠন সম্পাদক ডঃ শারদ হেবালকর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অন্যতম সহ সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে, হরিভাউ ভাজে, ডঃ রাজেন্দ্র কুশহা প্রমুখ। সভায় বর্তমান বিজয় নগরের রাজা ও রানীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন শ্রীহোসবলে। সংগঠনের আগামী দিনের লক্ষ্য, কার্যপদ্ধতি সহ একাধিক বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।

দুর্গাবাহিনীর রাখী বন্ধন

দুর্গা বাহিনীর পক্ষ থেকে জেলায় জেলায় রাখী বন্ধন উৎসব পালিত হলো। রাখী বন্ধনের দিন দুর্গা বাহিনীর বোনেরা জেলার বিভিন্ন স্থানে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করে। শহর, বাজার ছাড়াও স্কুল কলেজ ও সরকারি অফিসগুলিতে গিয়ে রাখী বাঁধা হয়।

এদিন হুগলী, হাওড়া, ব্যারাকপুর, কলকাতা সহ বিভিন্ন স্থানে রাখী বন্ধনের আয়োজন করা হয়। পাণ্ডুয়ায় রাখী বন্ধন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের দক্ষিণ-বঙ্গের সেবা প্রমুখ ডাঃ সনৎ বসু মল্লিক, বাহিনীর প্রদেশ সংযোজিকা সুভদ্রা শর্মাসহ অন্যান্যরা।

ইউএপিএ প্রত্যাহারের দাবী

বেআইনি কার্যকলাপ নিরোধ তথা ইউ এ পি এ আইন প্রত্যাহারের দাবী জানাল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির খড়্গপুর শাখা। খড়্গপুর টাউন হলের এক সভায় এই দাবী জানানো হয়। সভায় মানবধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র এই আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই আইনে বিনা বিচারে ১৮০ দিন অবধি পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়। টাডা ও পোটার মতোই এই আইনে অভিযুক্তকেই নির্দোষ প্রমাণ করতে হয়। সন্ত্রাসবাদে মদত দিচ্ছে এমন দোহাই দিয়ে এই আইনের বলে যে কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যায়। এদিন এই সভায় বক্তরা ইউ এ পি এ আইন প্রত্যাহারের পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর অত্যাচারেরও নিন্দা করেন।

বিদ্যার্থী পরিষদের রাখী বন্ধন

বর্ধমানের থ্যালাসেমিয়া হাসপাতালের শিশুদের রাখী পড়াল বিদ্যার্থী পরিষদের বর্ধমান নগর শাখা। রাখী বন্ধনের দিন অনিরুদ্ধ বিশ্বাস ও দেবশ্রী ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পরিষদের একটি দল হাসপাতালের শিশুদের রাখী পড়ায়। বর্ধমানের পাশাপাশি এদিন বিশ্বভারতীতেও রাখী বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। বিশ্বভারতীর পাঠভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবনসহ বেশ কয়েকটি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের রাখী পড়ানো হয়। এছাড়াও বীরভূম জেলার সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ, হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে পরিষদের কার্যকর্তারা রাখী বন্ধনের আয়োজন করে। রাখী বন্ধন উৎসবের নেতৃত্ব দেন রূপক মন্ডল, অর্পিতা ঘোষ প্রমুখ।

রাখী পূর্ণিমা উৎসবে বাধা

গত ৫ আগস্ট বিদ্যার্থী পরিষদের হাওড়া জেলার পাঁচলা শাখার উদ্যোগে হাওড়া জেলার তিনটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেলকুলাই সি কে এ সি বিদ্যাপীঠ, বাসুদেবপুর কে এন পি সি হাইস্কুল ও বুড়িখালী ক্ষেত্রমোহন ইনস্টিটিউশন-এর ছাত্র-ছাত্রী এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে "রাখী বন্ধন" উৎসব পালন করা হয়।

বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকা, সব বয়সের সব ধর্মের নর-নারী অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই "রাখী বন্ধন" উৎসবে সহযোগিতা করেন।

এরই মধ্যে বেলকুলাই সি কে এ সি বিদ্যাপীঠে একজন সি পি আই এম ক্যাডার "রাখী বন্ধন" উৎসব সম্বন্ধে নোংরা ভাষায় মন্তব্য করেন, যা সকল ছাত্র-ছাত্রীকে আঘাত করে। অবশ্য পরে ওই সিপিএম ক্যাডার উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিদ্যার্থী পরিষদের কাছে অন্যায় স্বীকার করেন।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার শ্রীরামপুর নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায় গত ২৭ জুলাই পরলোক গমন করেন। তিন বছর ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। ১৯৪৬ সালে তিনি সঙ্ঘের প্রয়াত প্রচারক রামদা, নরেশ গাঙ্গুলী ও দেশাইদার সঙ্গে পরিচিত হন। সেসময় চাতরা দোলতলা শাখায় আসতেন। স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি ছিলেন অভিভাবক তুল্য। তিনি স্বস্তিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন।

হাওড়ার শিবপুরের বকুলতলা শাখার স্বয়ংসেবক তথা সমাজসেবী অভয় পদ নাগ গত ১৬ জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

মেদিনীপুর শহরের অলিগঞ্জ নিবাসী জগন্নাথ চক্রবর্তী গত ২১ জুলাই বার্ধক্যজনিত রোগে পরলোক গমন করেন। তিনি স্থানীয় বিদ্যাসাগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন। মেদিনীপুর শহরের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজের সঙ্গে তিনি সত্তর দশক থেকে যুক্ত ছিলেন। পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। '৯২ সালে রাম মন্দির নির্মাণ আন্দোলনে কারাবাসও করেন। হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতির কাজে তিনি ছিলেন উৎসর্গকৃত প্রাণ। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যাসহ বহু গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন।

চলে গেলেন হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া নগরের সেবা প্রমুখ তথা সংস্কার ভারতীর বাউড়িয়া শাখার সভাপতি লক্ষী মাইতির মাতা ভারতীদেবী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। গত ৪ আগস্ট নিজ বাসগৃহে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে চার পুত্র, চার কন্যাসহ নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন।

মালদা নিবাসী প্রাক্তন প্রচারক আশুতোষ বর্মনের মাতা বিমলা দেবী গত ২৫ জুলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মালদা শহরের স্বয়ংসেবকদের কাছে তিনি ছিলেন মাতৃতুল্য। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র ও দুই কন্যাসহ নাতি-নাতনীদের রেখে যান। তাঁর পুত্ররা সকলেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। সঙ্ঘময় ছিল বিমলাদেবীর সংসার।

Swastika
24 August - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

▲ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মহারাণা প্রতাপের বীরত্বব্যঞ্জক প্রতিমূর্তি।
◄ মঞ্চে শার্দূল সিংহ, দীনেশ বাজাজ, জেনারেল রায়চৌধুরী, গুলাব কোঠারী, বি ডি সুরেকা ও যুগলজী।

কলকাতায় মহারাণা প্রতাপের মূর্তি প্রতিষ্ঠা

এক অনন্য স্বাধীনতা সংগ্রামী রাণাপ্রতাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আজ আনন্দ ও গর্বের দিন। মহারাণা প্রতাপের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তি হিন্দুস্থানের যে কোনও প্রান্তেই প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই প্রতিষ্ঠিত মূর্তি কলকাতা শহরের প্রেরণার স্থল হয়ে উঠল। গত ১৫ আগস্ট বিকেলে কলকাতায় সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের সামনে মহারাণা প্রতাপের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে একথা বলেন প্রাক্তন স্থল সেনাধ্যক্ষ জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী।

রাজস্থান পরিষদ গত কয়েক বছর ধরে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে আসছে। গত ২০০৪-এর ৩০ মে কলকাতার ম্যাকফারসন পার্কের নাম পরিবর্তন করে মহারাণা প্রতাপ উদ্যান রাখা হয় এবং সেইসঙ্গে ওই পার্কে মহারাণার একটি আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন রাজ্যপাল আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। আবার ২০০৫-এর ২ জানুয়ারি তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ভৈরোঁসিং শেখাওয়াত ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস-এর নাম পরিবর্তন করে 'মহারাণা প্রতাপ সরণী' নামাঙ্কিত ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন।

এদিন সত্যানন্দ দেবায়তনের আশ্রমিকদের মঙ্গলাচরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মূর্তির নির্মাতা ভাস্কর গৌতম পাল ও মূর্তির বেদী নির্মাতা প্রযুক্তিবিদ চন্দন রায়-কে সংবর্ধনা জানানো হয়। এক বিশাল ৮ ফুট উচ্চ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত প্রায় ১৪ ফুট উচ্চতার অশ্বারোহী মহারাণা প্রতাপের বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তি, কলকাতা শহরের দর্শনীয় স্থানগুলির তালিকায় নিঃসন্দেহে একটি নতুন সংযোজন।

হিন্দী সাহিত্যিক গণেশ শংকর বিদ্যার্থীর রচনা থেকে উদ্ধৃত করে রাজস্থান পরিষদের উপাধ্যক্ষ যুগল কিশোর জৈথলিয়া বলেন, মহারাণা প্রতাপ শুধু শৌর্য-বীর্যের নয়, এদেশের হাজার-হাজার বছরের পরম্পরাগত সংস্কৃতিরও প্রতীক। শৌর্য ও সংস্কৃতির উপাসক বাংলার কাছে মহারাণা প্রতাপ তাই অত্যন্ত বরণীয় পুরুষ।

জেনারেল রায়চৌধুরী আরও বলেন, লড়াই হবে। মানুষ থাকলে লড়াই হবে। রাণা প্রতাপও যুদ্ধ করেছিলেন এবং তা মোগল বাদশা আকবরের সঙ্গে — তাঁর সেনাপতি মানসিংহ-র সঙ্গে। তাঁর এই যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তাঁর যে বিশাল হৃদয়ের পরিচয় লক্ষ্য করি, সেটাই বড় কথা। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক দীনেশ বাজাজ ও কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার রেহানা খাতুন।

সভার সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক গুলাব কোঠারী বলেন, রাজস্থানের ইতিহাসের স্মৃতিকে বাংলাতেও স্মরণ করা হচ্ছে, যা খুব মহত্ত্বপূর্ণ। রাণাপ্রতাপ ও মীরাবাঈ সারা দেশেই দু'টি সুপরিচিত নাম। রাজস্থানের রাণী পদ্মিনী দেশ ও নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং ধাত্রী পান্না দেশের জন্য নিজের পুত্রকে বলিদান দিয়েছেন। রাণাপ্রতাপ যে স্মরণীয় তার কারণ তাঁর স্বাভিমান। তিনি খুব বড় রাজা ছিলেন না। তাঁকে চিতোর থেকে উদয়পুরে চলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু স্বাভিমান ত্যাগ করেননি। নিজের পুত্র অমর সিংহকেও সর্বসমক্ষে তিরস্কার করতে দ্বিধা করেননি। স্বাভিমান রক্ষার জন্যই ছিল তাঁর যুদ্ধ। নিজের সংকল্প থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হননি।

এদিনের বর্ষণসিক্ত দিনেও অনুষ্ঠান স্থল ছিল পরিপূর্ণ। কলকাতার বহু বিশিষ্ট মানুষ এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাজস্থান পরিষদের সভাপতি শার্দুল সিং সকলকে ধন্যবাদ জানান। রাষ্ট্রগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সভা পরিচালনা করেন রাজস্থান পরিষদ-এর সাধারণ সম্পাদক রুগলাল সুরানা।

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হচ্ছে

পুজো মানেই ঠাকুর দেখা পুজো মানে হারিয়ে যাওয়া
পুজো মানেই খাওয়া-দাওয়া পুজো মানে চাওয়া-পাওয়া
পুজো মানেই একটু ছোঁয়া ওলটি-পালটি মুগ্ধ হওয়া

পুজো সংখ্যার অনবদ্য পুষ্পাঞ্জলি

উপন্যাস
সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত
সুমিত্রা ঘোষ
দীপঙ্কর দাস
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

গল্প
রমানাথ রায়
শেখর বসু
এষা দে
গোপালকৃষ্ণ রায়
দীপক চন্দ্র,
জিষ্ণু বসু

ষষ্ঠীতে দেবী ভাবনা
সপ্তমীতে গল্প
অষ্টমীতে প্রবন্ধ
নবমীতে উপন্যাস
দশমীতে ছড়া
শেষ প্রহরে রম্যরচনা

প্রবন্ধ
প্রণব চট্টোপাধ্যায়
প্রণব রায়
দেবীপ্রসাদ রায়
তথাগত রায়
রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
দীনেশচন্দ্র সিংহ
বলরাম চক্রবর্তী
নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য

সত্বর কপি বুক করুন ● দাম চল্লিশ টাকা মাত্র

রম্যরচনা ঃ চণ্ডী লাহিড়ী ● ছড়াকাহিনী ঃ শিবাশিস দত্ত ● দেবী প্রসঙ্গ ঃ স্বামী অশোকানন্দ

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com